পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত

দেশকে অস্থিতিশীল করা ও নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত

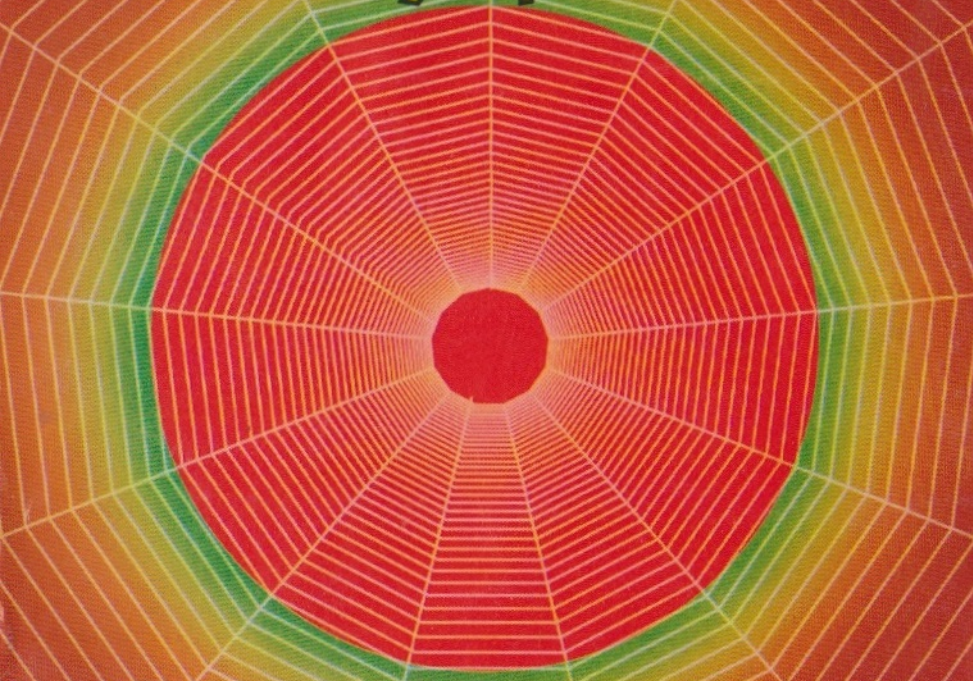

সোসাইটি ওয়াচ

পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত মতামত

দেশকে অস্থিতিশীল করা
ও
নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত

সম্পাদনায়

আবু মুশআব

সোসাইটি ওয়াচ

www.pathagar.com

দেশকে অস্থিতিশীল করা
ও
নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত

সম্পাদনায়
আবু মুশআব

প্রকাশনায়
সোসাইটি ওয়াচ
মায়া কানন, মসজিদ রোড
সবুজবাগ, ঢাকা

প্রকাশকাল ঃ
অগ্রহায়ন - ১৪১৪
নভেম্বর - ২০০৭

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১২.০০ (বারো) টাকা মাত্র

www.pathagar.com

সূচি

১। কেন এই সংকলন? ০৫

২। যুদ্ধাপরাধ স্বাধীনতাবিরোধী
নিয়ে শূন্যে গদা ঘুরানো হচ্ছে - দূরবীন ০৭

৩। কাদের বিচারের কথা কারা বলছে ২৩
মন্তব্য প্রতিবেদন- দৈনিক ইত্তেফাক

৪। রূঢ় বাস্তব এবং আইন-কানুনের আলোকে
জনাব মুজাহিদের মন্তব্যের বিশ্লেষণ ২৬
আসিফ আরসালান

৫। বর্তমান বাস্তবতা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি ৩১
সৈয়দ আবুল মকসুদ

৬। যুদ্ধারাধীদের বিচার দাবির নেপথ্যে ৩৭
ড. মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌

৭। নিরপেক্ষতা হারাচ্ছে নির্বাচন কমিশন ৪৪
ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

৮। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা ৪৯
সরদার আব্দুস সাত্তার

৯। সে সময় যুদ্ধাপরাধীরা যেভাবে রক্ষাপায় ৫৪
মোড়ল নজরুল ইসলাম

১০। যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে একটি দলিল ৫৬
কাজী সাঈদ

১১। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নয় ৬০
ডা. ওয়াজেদ এ. খান

১২। Overstressing the caretaker govt. ৬৫
Editorial - The daily New Naiton

১৩। চলমান ইস্যু সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিদের অভিমত ৬৭

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কেন এই সংকলন?

অনেক রক্ত ও ত্যাগের বিনিময়ে ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। বিগত ৩৬ বছরে বাংলাদেশ বিশ্ব ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক সেনা বাহিনী জাতিসংঘ কর্তৃক বিভিন্ন দেশে প্রেরিত শান্তি মিশনে সুনাম ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে দেশের ভাব মর্যাদা উজ্জ্বল করেছে। ১৯৯১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক সাফল্য অর্জন করেছে, গণতন্ত্র চর্চায় বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের মাধ্যমে বিগত তিনটি জাতীয় সংসদ নির্বাচন বিশ্বের গণতন্ত্রমনা মানুষের নিকট ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে। একটি মহল ২০০১ সালে ৪ দলীয় জোট সরকার গঠনের পর থেকে দেশকে অকার্যকর, ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত করার ষড়যন্ত্র করতে থাকে। তারা দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি অস্বাভাবিক করার লক্ষ্যে নৈরাজ্যকর কর্মসূচী পালন করতে থাকে। শত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্বাভাবিকভাবে ৮ম জাতীয় সংসদের মেয়াদ শেষ হবার পর ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে দেশে অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে নির্বাচন বানচালের চেষ্টা করা হয়। ২৮ শে অক্টোবর'০৬ সারা দেশে হত্যা, খুন ও সন্ত্রাসী তান্ডবতা চালিয়ে গোটা দেশকে জিম্মি করে ফেলা হয়। দেশ যখন নিশ্চিত নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির দিকে ধাবিত হচ্ছিল তখনই দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনী এগিয়ে আসে এবং বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে উদ্ধার করে।

বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার নির্বাচনী রোডম্যাপ ঘোষণা করে সেই লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে। দেশব্যাপী শুরু হয়েছে নতুন ভোটার তালিকা তৈরীর কাজ। জনগণের দৃষ্টি ২০০৮ সালের ৯ম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দিকে। তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান ও সেনাবাহিনী প্রধান যথাসময় নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

ঠিক এমনি এক মুহূর্তে গত ২৫ অক্টোবর নির্বাচন কমিশনের সাথে আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের নিকট জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেলের প্রদত্ত একটি বক্তব্য নিয়ে শুরু হয় তোলপাড় এবং এ সূত্র ধরেই ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রসঙ্গ টেনে এনে দেশে এক বিভ্রান্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালানো হচ্ছে। অবশ্য ঐ বিশেষ মহলটি তাদের আশির্বাদপুষ্ট মিডিয়ার মাধ্যমে অনেক আগ থেকেই এ ধরনের প্রচারণা চালাচ্ছিল। এসব মিডিয়া 'টকশো'র নামে সংবিধানের ভুল ব্যাখ্যা প্রদান করে ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের বক্তব্য বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে মিডিয়া সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের উদ্দেশ্য দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করে আগামী সংসদ নির্বাচন বানচাল করা এবং বিদেশী শক্তির হস্তক্ষেপের পথ প্রশস্ত করা।

বাংলাদেশের সংবিধানের আলোকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাদের এ বক্তব্য ভিত্তিহীন, অযৌক্তিক ও সংবিধান বিরোধী। বিশেষ করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের

www.pathagar.com

বিষয়টি স্বাধীনতার স্থপতি মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান নিষ্পত্তি করে গিয়েছেন। ১৯৭৩ সালে ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশের মধ্যে অব্যাহত আলোচনার ফল হিসেবে উপমহাদেশে শান্তি ও সমঝোতার স্বার্থে এবং পাকিস্তান সরকারের ভুল স্বীকার ও বাংলাদেশের জনগণের কাছে 'Forgive and forget'এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সরকার যুদ্ধাপরাধীদের ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং ১৯৫ জন চিহ্নিত যুদ্ধাপরাধী ছেড়ে দেয়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ উদ্ভুত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইস্যুর সমাপ্তি ঘটে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় যারা দ্বিমত পোষণ করে মহান মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেনি তাদের অপরাধের দৃষ্টিকোন থেকে স্বাধীনতা বিরোধী বা স্বাধীনতা যুদ্ধে দ্বিমত পোষণকারীদের অপরাধমূলক কাজের শাস্তি বিধানের জন্য ১৯৭২ সালের ২৪ শে জানুয়ারী দালাল আইন জারী করা হয়। এ আইনের অধীনে প্রায় ১ লাখ লোক গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে অভিযোগ আনা হয় ৩৭,৪৭১ জনের বিরুদ্ধে। তনমধ্যে ৩৪,৬২৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রমাণের অভাবে কোন মামলা দায়েরই সম্ভব হয়নি। ২৮৪৮ জনে বিচারে সোপর্দ করা হয়। বিচারে ৭৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং ২০৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ক্ষমা ঘোষণার ফলে শাস্তিপ্রাপ্ত ও অভিযুক্ত সকলেই মুক্তিলাভ করে। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারীতে জিয়াউর রহমান দালাল আইন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেন। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সংক্রান্ত এবিষয়টির এভাবেই আইনগত ভাবে পরিসমাপ্তি ঘটে। আজ নতুন করে যারা এ ইস্যু সৃষ্টি করে মিডিয়ায় ঝর তুলছেন তারা মূলতঃ বর্তমান তত্ত্বধায়ক সরকারকেই বিব্রতকর অবস্থায় ফেলতে চান।

পাশাপাশি তারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী উত্থাপন করে দেশে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাংলাদেশের সংবিধানের ২ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রীয় আদর্শের ভিত্তিতে ও ৮ (১) (১ক), ২ (২ক) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী একমাত্র ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করারই সুযোগ স্থাপিত হয়েছে। যারা ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবী করছেন তারা মূলতঃ সংবিধানের উল্লেখিত ধারা ও অনুচ্ছেদের বিরুদ্ধেই কথা বলছেন।

এ ধরনের অযৌক্তিক ও সংবিধান বিরোধী দাবী উত্থাপন করে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর অনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে ঐ সব সুবিধাবাদীরা বাংলাদেশের শান্তি, শৃংঙ্খলা বিনষ্ট ও সরকারের মূল এজেন্ডা বাস্তবায়নে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে তারা বাংলাদেশকে একটি অকার্যকর রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

তাদের কর্মকান্ড ও অযৌক্তিক দাবীর বিরুদ্ধে দেশবাসী উদ্বিগ্ন, উৎকণ্ঠিত। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় দেশপ্রেমিক সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ গবেষকগণ তাদের লেখনীর মাধ্যমে চক্রান্তকারীদের বিরুদ্ধে তাদের বিশ্লেষণ তুলে ধরে মুখোশ উন্মোচন করেছেন। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত এসব গুরুত্বপূর্ণ লেখা নিয়ে একটি সংকলন বের করা হলো। আশা করি দেশবাসী চক্রান্তকারীদের আসল উদ্দেশ্য বুঝতে সক্ষম হবেন এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষায় এগিয়ে আসবেন।

আবু মুশআব

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধ স্বাধীনতাবিরোধী প্রসঙ্গ নিয়ে শূন্যে গদা ঘুরানো হচ্ছে

দূ র বী ন

আইন, বাস্তবতা কোন কিছুর তোয়াক্কা না করে যুদ্ধাপরাধ, স্বাধীনতাবিরোধী প্রসঙ্গ নিয়ে শূন্যে গদা ঘুরানো হচ্ছে। স্বাধীনতার স্থপতি, স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশ সরকারের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান নিজে যেখানে যুদ্ধাপরাধী প্রশ্নের ইতি ঘটিয়েছেন, এমনকি দালাল আইন যেখানে আপনাতেই অকার্যকর, অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে শেষ হয়ে গেছে, সেখানে বিনা কারণে, বিনা প্রমাণে স্বাধীনতার ছত্রিশ বছর পর জামায়াতে ইসলামীকে এসবের সাথে জড়িত করে নানা রকম কথা বলা হচ্ছে। অভিজ্ঞ মহলের অভিমত, এই অপচেষ্টার মধ্যে সুস্পষ্ট দুরভিসন্ধি রয়েছে। তারা মনে করছেন, চোররাই চোর চোর বলে চিৎকার করছে, কেউ আবার না ভেবে না বুঝেই তাদের সাথে কোরাশ তুলছেন। জামায়াতের আপোষহীন দেশপ্রেমই অপরাধ হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি মহলের কাছে। স্বাধীনতার শত্রু ঐ মহলটিই 'শত্রুর মিত্র শত্রু' এই তত্ত্ব অনুসারে জামায়াতকে বৈরী ভাবছেন। মনে করা হচ্ছে, আইন ও বাস্তবতার দৃষ্টিকোণ থেকে যে ইস্যুটির ইতি ঘটেছে, তাকে রাজনৈতিক প্রয়োজনেই জিইয়ে রাখা হচ্ছে।

'স্বাধীনতাবিরোধী', 'যুদ্ধাপরাধী' এই শব্দগুলো আইনের দৃষ্টিতে খুবই গুরুতর শাস্তিযোগ্য বিষয়। স্বাধীনতা যুদ্ধ শেষ হবার ৩৬ বছর পর যদি কারও বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা হয়, তাহলে তার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হবে, এটাই স্বাভাবিক। যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত হয়, তাদের বিচার হয় যুদ্ধের পরই। অবশ্য কোন চিহ্নিত হওয়া তালিকাভুক্ত যুদ্ধপরাধী পালিয়ে থাকলে, যখনই সে ধরা পড়ে তখন তার বিচার হয়। যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর নুরেমবার্গ ট্রায়ালে সব যুদ্ধাপরাধীর বিচার ও শাস্তি হতে পারেনি। বড় বড় অপরাধী অনেকেই পালিয়ে ছিল। যারা পালিয়ে ছিল, তাদের বিচার যখনই তারা ধরা পড়েছে তখনই হয়েছে। কিন্তু কারা যুদ্ধাপরাধী তার অনুসন্ধান ও তালিকা প্রণয়ন কিন্তু নুরেমবার্গ ট্রায়াল এবং তার আগেই সম্পন্ন হয়েছে। শুধু পলাতকদের বিচার সম্পন্নের কাজ পরে হয়েছে, তারা ধরা পড়ার পর।

www.pathagar.com

আমাদের দেশও একটা মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে। এ যুদ্ধেও যুদ্ধাপরাধ সংঘটিত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ সমাপ্ত হওয়ার পর তাই যুদ্ধাপরাধীদের চিহ্নিত করার জন্যে যুদ্ধাপরাধের তদন্তও হয়েছে। সে তদন্তের আওতায় ছিল পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও তাদের সহায়ক বাহিনীগুলো। তদন্তের মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত হয়। ১৯৭৩ সালের ১৭ই এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত হওয়া এবং তাদের বিচারের সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করে। সরকারি ঘোষণায় বলা হয় ;

"Press Release of the Government of Bangldesh on War Crimes Trial (17 April 1973)

Investigations into the crimes commited by the Pakistani occupation forces and their auxiliaries are almost complete. Upon the evidence, it has been decided to try 195 persons of serious crimes, which include genocide, war crimes, crimes against humanity, breaches of Article 3, of the Geneva Conventions, murder, rape and arson.

Trials shall be held in Dacca before a Special Tribunal, consisting of judges having status of judges of the Supreme Court.

The trials will be held in accordance with universally recognized judicial norms eminent international jurists will be invited to observe the trials. The accused will be afforded facilities to arrange for their defence and to engage counsel of their choice, including foreign counsel. A comprehensive law providing for the constitution of the Tribunal, the procedure to be adopted and other necessary materials is expected to be passed this month. The accused are expected to be produced before the Tribunal by the end of May 1973."[১]

বাংলাদেশ সরকারের এই বিজ্ঞপ্তি অনুসারে ১৯৭৩ সালের মে মাসের শেষ দিকে যুদ্ধাপরাধীদেরকে বিচারিক ট্রাইব্যুনালের সামনে হাজির করার কথা ছিল, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যুদ্ধাপরাধীদের ট্রাইব্যুনালে হাজির করা হয়নি। পরবর্তী এক বছরের বিভিন্ন সময়ে পাকিস্তান ও ভারত, বাংলাদেশ ও ভারত এবং বাংলাদেশ-পাকিস্তান-ভারতের মধ্যে অব্যাহত আলোচনার ফল হিসেবে উপমহাদেশে শান্তি ও সমঝোতার স্বার্থে এবং পাকিস্তান সরকারের ভুল স্বীকার ও বাংলাদেশের জনগণের কাছে 'forgive and forget'-এর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সরকার যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। ১৯৭৪ সালের ৯ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া-পাকিস্তানের মধ্যে চূড়ান্ত আলোচনা শেষে এক এ্যাগ্রিমেন্টের মাধ্যমে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীকে ছেড়ে দেবার সিদ্ধান্ত হয়। 'এ্যাগ্রিমেন্টটিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রী আজিজ আহমদ এবং ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শরণ সিং। ত্রিদেশীয় এই এ্যাগ্রিমেন্টের সংশ্লিষ্ট ধারায় বলা হয়;

"13. The question of 195 Pakistaini prisoners of war was discussed by the three Ministers, in the context of the earnest desire of the Goverments for reconciliation, peace and in friendship in the subcontinent. The Foreing Minister of Bangladesh states that the excesses and manifold crimes committed by these prisoners of war constituted, according to the relevant provisions of the U.N. General Assembly Resolutions and International Law, war crimes, crimes against humanity and genocide and that there was universal consensus that persons charged with such crimes as the 195 Pakistani prisoness of war should be held to acount and subjected to the due process of law. The Minister of State for Defence and Foreign Affairs of the Government of Pakistan said that his Goverment condemned and deeply regretted any crimes that may have been committed.

14. In this connection the three Ministers noted that the matter should be viewed in the context of the determination of the three countries to continue resolutely to work for reconciliation. The Ministers further noted that following recognition, the Prime Minister of Pakistani had declared that he would visit Bangladesh in response to the invitation of the Prime Minister of Bangladesh and appealed to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past in order to promote reconciliation. Similarly, the Prime Minister of Bangladesh had declared with regard to the atrocities and destruction committed in Bangladesh in 1971 that he wanted the people to forget the past and to make a fresh start, stating that the people of Bangladesh knew how to forgive.

www.pathagar.com

15. In the light of the foregoing and in particular, having regard to the appeal of the Prime Minister of Pakistani to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past, the Foreign Minister of Bangladesh stated that the Government of Bangladesh had decided not to proceed with the trials as an act of clemency. It was agreed that the 195 prisoners of war may be repatriated to Pakistani along with the other prisoners of war now in the process of repatriation under the Dellhi Agreement."[২]

এইভাবে ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী ছেড়ে দেবার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ-উদ্ভূত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ইস্যুর ইতি ঘটে।

মুক্তিযুদ্ধকালে যারা স্বাধীনতায় যোগ দেয়নি কিংবা স্বাধীনতা যুদ্ধের রাজনৈতিক বা অন্য অপরাধমূলকভাবে বিরোধিতা করেছে, তারা তাদের অপরাধের দৃষ্টিকোণ থেকে স্বাধীনতাবিরোধী বা স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে দ্বিমতপোষণকারী। স্বাধীনতাত্তোর সরকারকে এদের সমস্যাও মোকাবিলা করতে হয়। এ জন্যে তদানীন্তন সরকার 'যুদ্ধাপরাধী' বিষয়ের বাইরে এদের অপরাধমূলক কাজের শাস্তি বিধানের জন্যে ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি 'দালাল আইন' জারি করা হয়। এই আইনের অধীনে প্রায় ১ লাখ লোককে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্যে থেকে অভিযোগ আনা হয় ৩৭ হাজার ৪শ ৭১ জনের বিরুদ্ধে। এই অভিযুক্তদের মধ্যে ৩৪ হাজার ৬শ' ২৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষী-প্রমাণের অভাবে কোনো মামলা দায়েরই সম্ভব হয়নি। ২ হাজার ৮শ ৪৮ জন বিচারে সোপর্দ হয়। বিচারে ৭শ ৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং অবশিষ্ট ২ হাজার ৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। ১৯৭৩ সালের ৩০ নবেম্বর শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ সরকার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন বিরোধ, বিতর্ক, বিভেদ মুছে ফেলার জন্যেই এ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। এই ক্ষমা ঘোষণার ফলে দালাল আইনের অধীনে ছোট-খাট অপরাধে শাস্তি প্রাপ্ত, অভিযুক্ত সকলেই জেল থেকে বেরিয়ে আসে। সাধারণ ক্ষমায় কিন্তু হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের অপরাধকে ক্ষমা করা হয়নি। অর্থাৎ স্বাধীনতা যুদ্ধকালে এইসব অপরাধ যারা করেছে, তাদের অভিযুক্ত করা ও শাস্তি দেয়ার দরজা উন্মুক্ত রাখা হয়। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে জিয়াউর রহমান দালাল আইন সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করেন। কিন্তু তার আগে এই আইনের অধীনে ২ বছর ১ মাস সময় গত হয়। এই দীর্ঘ সময়ে ঐ চার অপরাধের জন্যে উক্ত আইনের অধীনে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধেই কোন মামলা দায়ের হয়নি। সম্ভবতঃ এই কারণেই অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়া এই আইনকে জিয়াউর রহমান বাতিল করেন।

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধ আইন দালাল আইনের এই আলোচনা থেকে পরিষ্কার যে মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট ও অগ্নিসংযোগের মত বড় অপরাধসহ ছোট-খাট অপরাধের বিচারের ব্যবস্থা ও উদ্যোগ স্বাধীনতা-উত্তর আওয়ামী লীগ সরকার গ্রহণ করেছিলেন। প্রাপ্ত অভিযোগের বিচারও হয়েছে। বিচারের জন্যে আইন ও মামলা দায়েরের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ১৯৭৩ সালের ৩০শে নবেম্বর থেকে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি ২ বছর এক মাসে উক্ত দালাল আইনের অধীনে হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগ অপরাধের আর কোনো মামলা হয়নি। দায়ের করার মত অভিযোগ বা মামলা না থাকা বা মামলার উদ্যোগ গ্রহণের প্রয়োজন বোধ না করাই এর কারণ। ফল হিসেবেই দালাল আইন বাতিল হয়ে যায়।

সুতরাং নিশ্চিত হওয়া গেল যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় বড়-ছোট যে অপরাধমূলক ঘটনা দালাল কলাবরেটররা ঘটিয়েছে, মুক্তিযুদ্ধ-উত্তর স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার তার বিচারের ব্যবস্থা করেছে, অপরাধীদের বিচার করেছে। তারপর নিছক কলাবরেশন ও ছোট-খাটো অপরাধকারীদের জন্যে ক্ষমা ঘোষণা করেছে এবং বড় বড় অপরাধের বিচারের পথ উন্মুক্ত রেখেছে। কিন্তু দীর্ঘ ২ বছরেও বড় বড় অপরাধের কোন অভিযোগ না আসায় সে আইনও বাতিল হয়েছে। এখন দীর্ঘ ৩১ বছর পর কেউ যদি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ের অপরাধের বিচারের শ্লোগান তোলে এবং বলে যে, জনগণের অর্থাৎ অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে অভিযোগের প্রয়োজন নেই, সরকারকেই অভিযোগ আনতে হবে, তাহলে তাকে কাণ্ডজ্ঞানহীনই বলতে হবে।

প্রশ্ন হলো এই কাণ্ডজ্ঞানহীনতা কেন? উত্তর হলো, এটা একটা কাণ্ডজ্ঞানহীন রাজনীতি। যারা জামায়াতে ইসলামীকে টার্গেট করে যুদ্ধাপরাধী তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কথা বলছেন, তারা খুব ভালো করেই জানেন, জামায়াতের উল্লেখযোগ্য লোকদের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধোত্তর আওয়ামী লীগ সরকারের দীর্ঘ সময়ে যেমন কোন অভিযোগ ওঠেনি, তার ৩১ বছর পরও আজ তেমনি কোনো সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা সম্ভব হবে না। তাহলে তারা হৈ চৈ করছেন কেন? উত্তর সেই একটাই- রাজনীতি। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই সময়ে সময়ে এমন হৈ চৈ জামায়াতের বিরুদ্ধে বাধানো হয়, আবার রাজনৈতিক প্রয়োজনেই তার ইতি ঘটানো হয়। পেছনে তাকালে এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যাবে।

তবে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে এই অভিযোগ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপ নেয়। জেনারেল এরশাদের শাসনামলে জামায়াতের বিরুদ্ধে অভিযোগের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। জামায়াতের অঘোষিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমকে বিদেশী নাগরিক অভিহিত করে তাঁকে দেশ থেকে বহিষ্কারের

www.pathagar.com

জন্যে মহা হৈ চৈ তোলা হয়েছিল। এর পিছনে ছিল রাজনীতি। প্রেসিডেন্ট এরশাদ এই হৈ চৈ তোলার মাধ্যমে একটি মহলকে খুশী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু হঠাৎ করেই একদিন এরশাদ সরকারের হৈ চৈ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। রাজনৈতিক কারণে শুরু হয়েছিল এটা জানি, কিন্তু এরশাদ সরকার হঠাৎ চুপ মেরে গিয়েছিলেন কেন সেটা আমার জানা নেই।

১৯৯১ সালে জামায়াত নিজে ক্ষমতার শরিক না হয়েও বিএনপিকে সরকার গঠনে সাহায্য করার পর বিক্ষুব্ধ আওয়ামীবলয় এরশাদ সরকারের পরিত্যক্ত হৈ চৈ টাকে মহাআকার দিয়ে আবার জিন্দা করে তোলে। ১৯৯২ সালের জানুয়ারিতে গঠিত হয় '৭১-এর ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। আওয়ামী লীগ বলয়ের সকল সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন এতে শামিল হয়। '৭১-এর ঘাতক দালালদের নির্মূল করাকে এরা লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামীই হয় একমাত্র টার্গেট। জামায়াতে ইসলামীর অঘোষিত আমীর অধ্যাপক গোলাম আযমসহ জামায়াত নেতাদের বিচারের জন্য তারা গণআদালত বসায় মহাআড়ম্বরে। ড. কামাল হোসেনের মত অনেক বিজ্ঞ আইনজীবী অবিজ্ঞের উন্মাদ-উৎসাহ নিয়ে এ গণআদালতে শামিল হন। তারা জামায়াতে ইসলামীর জন্যে একটা শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন। কিন্তু অশ্বডিম্ব প্রসব করে এই আন্দোলনটি ধীরে ধীরে ঝিমিয়ে পড়ে। কারণটি ছিল বিএনপি সরকারের পতনের আন্দোলন এবং '৯৬-এর নির্বাচন। যে আওয়ামী লীগ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি করে জামায়াতে ইসলামীকে নির্মূলের আন্দোলন করলো, সেই আওয়ামী লীগ বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে জামায়াতকে নিয়ে যুগপৎ আন্দোলন করতে একটুও লজ্জাবোধ করলো না। এভাবে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির মাধ্যমে জামায়াতকে নির্মূল করার যে আন্দোলন আওয়ামী লীগরা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে শুরু করেছিল, আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক প্রয়োজনেই তা শেষ হয়ে যায়। এই রাজনৈতিক প্রয়োজনের মধ্যে জামায়াতের জনপ্রিয়তা বেড়ে চলায় ভীতি এবং আওয়ামী রাজনীতি নিয়ে তাদের সমর্থকদের মধ্যেও প্রশ্ন সৃষ্টি হওয়ার আশংকাও শামিল ছিল। সম্প্রতি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক রিমান্ডে থাকাকালে জিজ্ঞাসাবাদের সময় ঘাদানিকদের আন্দোলন নিয়ে কেন তারা বেশি দূর আগায়নি, কেন তারা পিছুটান দিয়েছিল আন্দোলন থেকে, এমন প্রশ্নের জবাবে বলেছিলেন যে, জামায়াতে ইসলামী বেশি প্রচার পাচ্ছিল এই কারণেই তারা আন্দোলন থেকে সরে যায়। এটাও একটা কারণ অবশ্যই। কিন্তু আসল কারণ ছিল, জামায়াতে ইসলামীকে তাদের প্রয়োজন হয়েছিল বিএনপিকে একঘরে করে '৯৬-এর নির্বাচনে নিজেদের বিজয় নিশ্চিত করা।

২০০১ সালের নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ও ঐক্যবদ্ধ নির্বাচনের জন্যে বিএনপি-জামায়াত ঐক্য যখন আসন্ন হয়েছিল, তখন

www.pathagar.com

জামায়াতকে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধী, একাত্তরের দালাল অভিহিত করে জামায়াতের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল। ২০০১ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়ন ও ঘাদানি কমিটি সৈয়দ হাসান ইমামের সভাপতিত্বে শহীদ মিনার চত্বরে একটা সম্মেলন করে। সম্মেলনে বক্তাদের মধ্যে ছিলেন আওয়ামী লীগ সরকারের পানিসম্পদ মন্ত্রী আব্দুর রাজ্জাক, নৌ পরিবহন প্রতিমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া, মুক্তিযোদ্ধা সংসদের সভাপতি অধ্যক্ষ আহাদ চৌধুরী, সিপিবি'র সভাপতি মঞ্জুরুল আহসান খান, এডাব সভাপতি খুশী কবির, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক নেতা ড. আখতারুজ্জামান, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ড কাউন্সিলের সাবেক সভাপতি আব্দুল মতিন চৌধুরী, জাসদের রওশন জাহান সাথী, ছাত্রলীগ সভাপতি বাহাদুর বেপারী ও সাধারণ সম্পাদক অজয়কর খোকন। সম্মেলনে 'ধর্মীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ও ট্রাইব্যুন্যালে ইসলামী রাজনীতিকদের বিচার দাবি' করে বক্তারা বলেন, 'দেরীতে হলেও সরকার মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে (জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ, মুফতি ফজলুল হক আমিনী ও শায়খুল হাদীস আল্লামা আজিজুল হক গ্রেফতার হয়েছিলেন)। মৌলবাদীদের যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই আঘাত করতে হবে। আঘাতের পর আঘাতে ওদের খতম করতে হবে।' সভাপতির ভাষণে হাসান ইমাম বলেন, '৯২ সালে যে লড়াই শুরু হয়েছিল, এখন তা চূড়ান্ত পর্যায়ে শুরু হয়েছে। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল শেষ হয়েছে। ফাইনাল খেলায় দু'টি দল থাকে। এখন মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সকলে এক মঞ্চে, রাজাকাররা অপর মঞ্চে। এই খেলায় মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তির বিজয় হবে' *(ইনকিলাব, ৮ ফেব্রুয়ারি, ২০০১)*। এই বিজয়ের লক্ষ্যে জামায়াত ও ইসলামী শক্তির বিরুদ্ধে তারা প্রবল আন্দোলন শুরু করে। তাদের মিটিং, সম্মেলন ও দাবি-দাওয়ার মিছিল চলতে থাকে। তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠনের দাবি করে। ২ এপ্রিল

আজ দেশে জরুরি অবস্থার এক পর্যায়ে জামায়াত নেতৃত্বকে যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধী সাজাবার সেই ঘাদানিক আন্দোলন আবার জোরেশোরে শুরু হয়েছে। এ আন্দোলনে শাহ-রিয়ার কবীরদের মত পুরাতন মুখের সাথে নতুন কিছু মুখ যোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে আন্দোলনে নতুন গতি লাভের সুযোগ হয়। আন্দোলনের দাবিও আগের মত একই রয়ে গেছে। তবে জরুরি অবস্থা থাকার কারণেই সম্ভবতঃ এবারে মাঠে নয়, মিডিয়াকে কেন্দ্র করে চলছে এই আন্দোলন। দু'একটি চ্যানেল এবং

www.pathagar.com

২০০১ ঘাদানি কমিটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে দেখা করে 'জামায়াত -শিবির ও স্বাধীনতাবিরোধী মৌলবাদী চক্রের বিরুদ্ধে' আরও কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি করে। এই সাক্ষাৎকালেই জুনের প্রথম সপ্তাহে ঢাকায় মৌলবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ৫ দেশীয় সম্মেলনের সিদ্ধান্ত হয়। ঠিক হয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ সম্মেলন উদ্বোধন করবেন। এ সাক্ষাৎকারে হাজির ছিলেন শাহরিয়ার কবীর, অধ্যাপক কবীর চৌধুরীসহ অন্যান্যরা। ২৭ আগস্ট ২০০১ তারিখে ঘাদানি কমিটির সংগঠন, আওয়ামীবলয়ের আরেকটি হাতিয়ার ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন প্রেসক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ঘোষণা করে, মৌলবাদ ও রাজাকার আলবদরদের মনোনয়ন না দেয়ার ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের আহ্বানে সাড়া দিয়ে ২ কোটি ভোটার দস্ত খত করেছে। সাংবাদিক সম্মেলনে বলা হয়, ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলন, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক, সামাজিক, পেশাজীবী ও নাগরিক প্রতিষ্ঠান, নারী সংগঠন, তৃণমূল জনসংগঠন, উন্নয়ন কর্মী, মুক্তিযোদ্ধা, প্রগতিশীল মোর্চা, বাংলাদেশ মহিলা পরিষদ, বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতি, বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন, বাংলাদেশ সংবাদিক সমিতিসহ ১ হাজার ১শটি এনজিও এবং ৭৫০টি সংগঠনের ১০ লাখ কর্মী দেশব্যাপী এই স্বাক্ষর অভিযানে অংশ নেয়। এই সাংবাদিক সম্মেলনে ঐক্যবদ্ধ নাগরিক আন্দোলনের সভাপতি অধ্যাপক কবীর চৌধুরী ছাড়াও অন্যান্যের মধ্যে হাজির ছিলেন ড. কাজী ফারুক আহমদ, ড. আখতারুজ্জামান, অধ্যাপক আব্দুল মান্নান চৌধুরী, কল্যাণ সাহা' *(সংবাদ ২৮ আগস্ট, ২০০৭)*। নির্বাচনের আগে এই আন্দোলনকে তারা আরও তুঙ্গে নিয়ে যায়। তারা সম্ভবত ফাইনাল শো-ডাউন করে ২৪ সেপ্টেম্বর ২০০১ তারিখে সংসদ ভবনের সামনে এক মানববন্ধন আয়োজনের মাধ্যমে। এ মানববন্ধনের আয়োজন করে ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি। এতে অংশগ্রহণ করে মহিলা পরিষদ, প্রজন্ম'৭১, চারুশিল্পী সংসদ জাতীয় সমন্বয় কমিটি, ঐক্যবদ্ধ নাগরিক

কয়েকটি পত্রিকা ইসলামী দলগুলো বিশেষ করে জামায়াতের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দারুণভাবে সক্রিয়। এদের মতি গতি দেখলে মনে হয় এরা এই আন্দোলনকে মিশন হিসেবে নিয়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন এই লোকরা তো বিন-ালাভে তুলাও বয় না। কিন্তু তুলা নয়, লোহা যখন বইছে এরা, তখন বলতে হবে কোন রাজনৈতিক মতলবের তারা ক্রীড়নক। সেই রাজনৈতিক মতলব বা উদ্দেশ্যটা কি? এবং সে নটরাজনীতিক বা নট রাজনৈতিক পক্ষই বা কে?

www.pathagar.com

আন্দোলন, হিন্দু-বৌদ্ধ-খৃষ্টান ঐক্য পরিষদ, প্রশিকা, গ্রুপ থিয়েটার ফেডারেশন এবং বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম শিল্পী পরিষদসহ হেনা দাস, সি.আর দত্ত, কাইয়ুম চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক, চিত্রা ভট্টাচার্য, সেলিনা হোসেন, শ্যামলী নাসরিন, আবুল বার্ক আলভী, কাজী মুকুল, শাহরিয়ার কবীর প্রমুখ। মানববন্ধনে 'রাজাকার মুক্ত সংসদ গঠনের আহ্বান জানিয়ে জামায়াতের ৩০ জন এবং ইসলামী ঐক্যজোটের ৭ জন প্রার্থীর তালিকা প্রকাশ করে তাদের ভোট না দেবার আবেদন জানিয়ে অধ্যাপক কবীর চৌধুরী বলেন, রাজাকাররা যেন পার্লামেন্টে আসতে না পারে, সে জন্য জনগণকে সচেতন হতে হবে। আগামী ১লা অক্টোবরের ভোটে তাদের প্রত্যাখ্যান করতে হবে।' *(দৈনিক আল আমিন, ২১ অক্টোবর ২০০১)*।

চূড়ান্ত পর্যায়ে মানববন্ধনের এই আহ্বানের মধ্যে দিয়ে জামায়াতের বিরুদ্ধে ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি তথা আওয়ামীবলয়ের স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধ শ্লোগানের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য একেবারে নগ্ন হয়ে যায়। আওয়ামীবলয় চেয়েছিল জামায়াতকে স্বাধীনতাবিরোধী, যুদ্ধাপরাধী অভিহিত করে জামায়াতের সাথে জোট গঠনকারী বিএনপি'র ভোটও নষ্ট করতে।

নির্বাচনে জোট সংসদে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ও জামায়াত ৩০টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ১৭টি আসনে জয়লাভের পর দেশ থেকে, রাজনৈতিক ময়দান থেকে জামায়াতকে স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধী বলে গাল দেয়ার তুখোড় আন্দোলন শেষ হয়ে গেল। তার বদলে নির্বাচনের পরপরই ঐ ঘাদানিকদেরকেই সংখ্যালঘু নির্যাতনের শ্লোগান নিয়ে মাঠে নামতে দেখা গেল। জামায়াতের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন রাজনৈতিক প্রয়োজনে শুরু হয়েছিল, রাজনৈতিক কারণেই সে আন্দোলন নির্বাচনের পর শেষ হয়ে গেল। পরবর্তীকালে ২০০৭ নির্বাচনকে সামনে রেখে পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে এই আন্দোলনকে আবার মাথা তুলতে দেখা গেছে। দল হিসেবে জামায়াত এবং ব্যক্তি পর্যায়ে জামায়াত নেতাদের চরিত্র হননের জন্যে অব্যাহতভাবে মন্তব্য কলাম ও নিউজ আইটেম লিখা হয়েছে। লক্ষ্য ছিল জামায়াত সম্পর্কে, জামায়াত-নেতাদের ব্যাপারে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে জামায়াতকে দুর্বল করা এবং এ ধরনের জামায়াতের সাথে ঐক্যজোট না করতে বিএনপিকে বাধ্য করা, যাতে '৯৬ সালের মত বিএনপিকে একঘরে করে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে জিতে ক্ষমতায় যেতে পারে। কিন্তু মানুষ ঘাদানিকদের মিথ্যাচার বিশ্বাস করেনি, জামায়াত দুর্বল হয়নি এবং চারদলীয় জোটও ভেঙ্গে যায়নি।

আজ দেশে জরুরি অবস্থার এক পর্যায়ে জামায়াত নেতৃত্বকে যুদ্ধাপরাধী ও স্বাধীনতা বিরোধী সাজাবার সেই ঘাদানিক আন্দোলন আবার জোরেশোরে শুরু হয়েছে। এ আন্দোলনে শাহরিয়ার কবীরদের মত পুরাতন মুখের সাথে নতুন

www.pathagar.com

কিছু মুখ যোগ করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যাতে আন্দোলনে নতুন গতি লাভের সুযোগ হয়। আন্দোলনের দাবিও আগের মত একই রয়ে গেছে। তবে জরুরি অবস্থা থাকার কারণেই সম্ভবতঃ এবারে মাঠে নয়, মিডিয়াকে কেন্দ্র করে চলছে এই আন্দোলন। দু'একটি চ্যানেল এবং কয়েকটি পত্রিকা ইসলামী দলগুলো বিশেষ করে জামায়াতের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দারুণভাবে সক্রিয়। এদের মতি গতি দেখলে মনে হয় এরা এই আন্দোলনকে মিশন হিসেবে নিয়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড ব্যবসায় বুদ্ধি সম্পন্ন এই লোকরা তো বিনালাভে তুলাও বয় না। কিন্তু তুলা নয়, লোহা যখন বইছে এরা, তখন বলতে হবে কোন রাজনৈতিক মতলবের তারা ক্রীড়নক। সেই রাজনৈতিক মতলব বা উদ্দেশ্যটা কি? এবং সে নটরাজনীতিক বা নট রাজনৈতিক পক্ষই বা কে?

ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা এবং জামায়াতকে যুদ্ধাপরাধী বা স্বাধীনতা বিরোধী সাজাবার বিগত আন্দোলনের হোতা ছিল আওয়ামী লীগ সরকার। '৯২ উত্তর ঘাদানিক আন্দোলনও আওয়ামী বলয়ের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। আশির দশকে জামায়াতের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা বিরোধী ও অধ্যাপক গোলাম আযমকে দেশ থেকে বের করে দেয়ার যে আন্দোলন হয়, তার পেছনে ছিল এরশাদ সরকার। জামায়াত ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন, তার পেছনে অবশ্যই বড় কারও হাত রয়েছে। সে হাত এবার সরকারের অবশ্যই নয়। কারণ, এখন কোন রাজনৈতিক সরকার ক্ষমতায় নেই। ক্ষমতায় এখন নির্দলীয় ও নিরপেক্ষ সরকার। তারা এ ধরনের আন্দোলনের পেছনে থাকতে পারেন না। আইনী দিক থেকেও এ ধরনের আন্দোলনের পেছনে তাদের থাকার কথা নয়। তত্ত্বাবধায়ক সরকার এ বিষয়টা পরিষ্কারও করেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আইন উপদেষ্টা জনাব মইনুল হোসেন অতীতের রাজনৈতিক সরকার যে দায় গ্রহণ প্রয়োজনীয় মনে করেননি, সে দায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নয় বলেছেন। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান ড. ফখরুদ্দীন আহমদও এ দায় সরকারের নয় বলে উল্লেখ করে বলেছেন যে, কেউ সংক্ষুব্ধ বোধ করলে তিনি আদালতে যেতে পারেন। আদালতের দরজা খোলা।

আন্দোলনের সাথে ব্যক্তি সংশ্লিষ্টতার দিকের বিচারে '৯২ উত্তর এবং ২০০১ নির্বাচনপূর্ব ঘাদানিক আন্দোলনের সাথে বর্তমান আন্দোলনের ষোল আনা মিল আছে। কিন্তু এই আন্দোলনের পেছনে আওয়ামী বলয়ের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি হতে পারে! এখন দেশে জরুরি অবস্থা চলছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে চলছে ভাঙাগড়া। দেশের সবচেয়ে বড় দল বিএনপি বিভেদ বিতর্কের মধ্যে হাবুডুবু খাচ্ছে। কিন্তু আওয়ামী লীগও অক্ষত নয়। শীর্ষ দুই দুই নেতা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকসহ অনেক নেতা তাদের জেলে। এ সময় অতীতের ব্যর্থ আন্দোলন নতুনভাবে শুরু করার পেছনে আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কি হতে পারে?

www.pathagar.com

এ প্রশ্নে একাধিক বিকল্পের কথা বলা হচ্ছে। তার মধ্যে একটি হলো, আওয়ামী লীগ প্রতিদ্বন্দ্বী দল বিএনপি'র মধ্যেকার বিভেদ বিতর্কে খুবই আনন্দিত। জরুরি অবস্থায় আওয়ামী লীগের ক্ষতি হলেও দল অবিভক্ত রয়ে গেছে। সুতরাং আওয়ামী লীগ বিএনপি'র চেয়ে ভাল অবস্থানে। কিন্তু চারদলীয় জোটের জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী ঐক্যজোট অটুট আছে। এটা আওয়ামী লীগের জন্যে মাথা ব্যথার কারণ। বিএনপি দুর্বল হলেও তার মাঠ ময়দান ঠিক আছে। এই অবস্থায় জোট যদি অটুট থাকে এবং জোটের দ্বিতীয় প্রধান অংশ জামায়াতে ইসলামী যদি অটুট থাকে, তাহলে আওয়ামী লীগের কোন ভবিষ্যত নেই। সুতরাং ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের নামে যদি জামায়াতসহ ইসলামভিত্তিক দলের রাজনীতিকে বাধাগ্রস্ত করা যায় এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের শ্লোগান তুলে ইসলামী নেতৃত্বকে মামলা মোকদ্দমায় যদি জড়ানো যায়, তাহলে চারদলীয় জোটকে দুর্বল করে অবিভক্ত আওয়ামী লীগের ক্ষমতায় যাওয়ার পথ পরিষ্কার হতে পারে। তবে এর চেয়ে যে আশংকাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হচ্ছে, সেটা হলো বিদেশী ষড়যন্ত্রের বিষয়। প্রতিবেশী দেশ ভারত অন্ততঃ গত ১৫ বছরের অভিজ্ঞতায় পরিষ্কার বুঝেছে বাংলাদেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছ থেকে ট্রানজিট, গ্যাস, চিটাগাং বন্দর এবং অবাধ মার্কেটের সুযোগ ইত্যাদি তাদের কোন দাবিই পূরণ হবে না। এজন্যে সে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক সরকার চাচ্ছে না। বরং তারা মনে করছে যেভাবে ২২শে'র নির্বাচন বানচাল করা গেছে, সেভাবে যদি ২০০৮-এর নির্বাচন বানচাল করে দেশে সামরিক শাসন আনা যায়, তাহলে রাজনীতিক ও রাজনৈতিক দলের অসন্তুষ্টি এবং জনগণের হতাশা ও বিভ্রান্তির মুখে সামরিক বাহিনীকে জনগণের বিপরীতে দাঁড় করানো যাবে। এতে ভারত এক ঢিলে তার উদ্দেশ্য চরিতার্থের পথের তিনটি মূল বাধাকে বিপর্যস্ত করতে পারবে। দেশকে রাজনৈতিক নেতৃত্ব শূন্য করা অথবা রাজনৈতিকদের অকার্যকর করা, ইসলামী দল ও ইসলামী ব্যক্তিত্বকে দুর্বল করে এদেশী মুসলমানদের প্রতিরোধ

যে কোন বিচারেই এবারের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ক আন্দোলন শুরু হয়েছে রাজনৈতিক কারণেই।

যার যে উদ্দেশ্যই থাক, এ আন্দোলন একেবারেই শূন্যে গদা ঘোরানোর মত। যুদ্ধাপরাধের বিচার সংক্রান্ত আইনের কোন অস্তিত্ব এখন নেই। তেমনি দালাল আইনও এখন নেই। সুতরাং সরকারের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংক্ষুব্ধ হবার যৌক্তিক কোন কারণ নেই।

www.pathagar.com

শক্তির বড় উৎস ইসলামকে পথ থেকে সরিয়ে দেয়া এবং দেশ রক্ষার মূল শক্তি সেনাবাহিনীকে বিতর্কিত করা- এই তিন বাধা দূর করতে পারলে বাংলাদেশকে সহজেই সে সিকিম বানাতে পারে। এই ষড়যন্ত্রের বাস্তবায়নকে ভারত এখন আগের চেয়ে অনেক সহজ মনে করছে। এরই সুযোগ গ্রহণ করতে চাচ্ছে ভারত। এক্ষেত্রে আওয়ামী বলয়কে নগদ লাভের লোভ দেখিয়ে ভারত তাদের ব্যবহার করছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের মতো তাদের এজেন্ডা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। সুতরাং যে কোন বিচারেই এবারের ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধ করা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার বিষয়ক আন্দোলন শুরু হয়েছে রাজনৈতিক কারণেই।

যার যে উদ্দেশ্যই থাক, এ আন্দোলন একেবারেই শূন্যে গদা ঘোরানোর মত। যুদ্ধাপরাধের বিচার সংক্রান্ত আইনের কোন অস্তিত্ব এখন নেই। তেমনি দালাল আইনও এখন নেই। সুতরাং সরকারের পক্ষে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সংক্ষুব্ধ হবার যৌক্তিক কোন কারণ নেই। তবে যে কোন অপরাধের বিচার করার আইন বাংলাদেশে আছে। এই আইনে যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বিচার চাইতে পারেন, তবে সেটা যুদ্ধাপরাধ বা দালাল আইনের বিচার হবে না।

তবে যে কোন অপরাধের বিচার করার আইন বাংলাদেশে আছে।

এই আইনে যে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বিচার চাইতে পারেন, তবে সেটা যুদ্ধাপরাধ বা দালাল আইনের বিচার হবে না।

অবশ্য কেউ চাইলে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে যুদ্ধাপরাধ ও দালাল অপরাধকে জিইয়ে রাখতে পারেন, যতদিন মন চায় ততদিন। এটাই এখন চলছে।

অবশ্য কেউ চাইলে রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে যুদ্ধাপরাধ ও দালাল অপরাধকে জিইয়ে রাখতে পারেন, যতদিন মন চায় ততদিন। এটাই এখন চলছে।

শেষ করার আগে আরেকটা বলি, আজ নতুন করে যুদ্ধাপরাধী তৈরি বা দালাল বানানোর সুযোগ নেই। মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী বিচার প্রক্রিয়ার পর এই দরজা বন্ধ হয়ে গেছে। তবে বন্ধ হয়নি স্বাধীনতা বিরোধী তৈরি হওয়ার পথ। স্বাধীনতা বিরোধীরা অতীতে ছিল, এখনও তাদের ষড়যন্ত্র আছে। তবে মুক্তিযুদ্ধকালে যারা রাজনৈতিক কারণে এবং এক আশঙ্কার ফলে এর বিরোধিতা করেছিল, তারা কিন্তু এখন স্বাধীনতার সবচেয়ে বড় আন্তরিক সৈনিক। কারণ, এ দেশ ছাড়া তাদের যাবার আর কোন জায়গা নেই এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী গত ৩৬ বছরে তাদের স্বাধীনতা বিরোধিতার

www.pathagar.com

কোন চিহ্নও পাওয়া যায়নি, এমনকি সেরকম কোন অভিযোগও তাদের বিরুদ্ধে ওঠেনি, কিন্তু যারা মুক্তিযুদ্ধকালে এ দেশকে ভারতের কাছে বিকিয়ে দেবার সাত দফা গোপন চুক্তি করতে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে বাধ্য করেছিল, যারা মুক্তিযুদ্ধের পরপরই দিল্লী গিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে প্রস্তাব করেছিল বাংলাদেশকে ভারতের একটা প্রদেশ হিসাবে ভারতের সাথে যুক্ত করার, সেই স্বাধীনতা বিরোধীরা আছে এবং আশঙ্কা হয় যে তাদের বংশ বৃদ্ধিই ঘটছে।

শেষোক্ত ঘটনা দুটো স্মরণ করিয়ে দেবার জন্যে ইতিহাসের পেছনের পাতা একটু উল্টাতে হয়। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশকে সাহায্য করার বিনিময়ে ভারত এ নিশ্চয়তা চেয়েছিল যে, বাংলাদেশ তার অনুগত হয়ে থাকবে। এই নিশ্চয়তার দলিল হিসেবেই ভারত অবস্থার সুযোগ নিয়ে বাংলাদেশের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের মত বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের বাধ্য করেছিল অধীনতামূলক এক গোপন চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে। এই চুক্তির একটা বিবরণ দিয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে দিল্লীতে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান, স্বাধীনতার পর দিল্লীতে বাংলাদেশের প্রথম হাইকমিশনার এবং পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ এমপি এবং আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় শাসনামল '৯৬ থেকে ২০০১ সময়ে জাতীয় সংসদের স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী। তিনি এক সাক্ষাতকারে বলেন, "১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এক চুক্তিতে, প্যাক্ট নয়, এগ্রিমেন্ট আসেন। এই চুক্তি বা এগ্রিমেন্ট অনুসারে দু'পক্ষ কিছু প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক সমঝোতায় আসেন। প্রশাসনিক বিষয়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতের যে প্রস্তাবে রাজি হন তাহলো, যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, শুধু তারাই প্রশাসনিক পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকরিচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্য জায়গা পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা। ....সামরিক ক্ষেত্রে সমঝোতা হলো, বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে। ..... বাংলাদেশের নিজস্ব কোনো সেনাবাহিনী থাকবে না। আভ্যন্তরীণ আইন-শৃংখলা রক্ষার জন্যে মুক্তিবাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে। ..... বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যে চুক্তি হয়, সেটা খোলা বাজারভিত্তিক। খোলা বাজার ভিত্তিতে চলবে দু'দেশের বাণিজ্য। ....বৈদেশিক বিষয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার যে চুক্তিতে আসেন সেটা হলো, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে। ..... মূলতঃ বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারত। এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুহূর্তেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

www.pathagar.com

ভারত সরকারের সঙ্গে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এই পুরো ব্যবস্থাকেই অগ্রাহ্য করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এর কারণে আমি বিনাদ্বিধায় বলতে পারি যে, ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ বাংলাদেশ পাকিস্তানী সৈন্যমুক্ত হয় মাত্র, কিন্তু স্বাধীন-সার্বভৌম হয় ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারিতে যেদিন শেখ মুজিব পাকিস্তান জেল থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকা আসেন।"[৩]

স্বাধীনতা-উত্তর দীর্ঘ ৩৬ বছরে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে এই ধরনের স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আসেনি, যা এসেছে শাহরিয়ার কবীর ও চিত্ত সুতারদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ট্রাজেডি হলো, স্বাধীনতার শত্রু এই শাহরিয়ার কবীর ও চিত্ত সুতাররাই জামায়াতে ইসলামীকে স্বাধীনতা বিরোধী বলেন। ব্যাপারটা চোরের চোর চোর বলে চিৎকার করার মত। বিনা কারণে জামায়াতের সাথে শাহরিয়ার কবীরদের এই বৈরিতা কেন? কারণ হলো, শত্রুর মিত্র শত্রুই হয়। সময় সাক্ষি, সকল বিচারে জামায়াত দেশপ্রেমিক শক্তি-বলয়ের একটা বড় স্তম্ভ।

হুমায়ুন রশীদ সাহেব এখানে বলেছেন চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুহূর্তে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলাম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু অন্য সূত্রে শোনা গেছে তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি দেশ প্রেমিক এবং দেশের স্বাধীনতাকে তিনি ভালবাসতেন বলেই চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হওয়ার পর এর আঘাত তিনি সামলাতে পারেননি। যারা বাইরের যোগসাজসে বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে এই চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেছিল, তারাই বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রু, তারা স্বাধীনতা বিরোধী। এরা তখনও অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের আশপাশে ছিল বন্ধু সেজে, পরবর্তীকালেও ছিল এবং এখনও আছে তারা বাংলাদেশে।

মুক্তিযুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে স্বাধীনতা অর্জনের পরই বাংলাদেশের স্বাধীনতার শত্রুতার আরেকটি বড় ঘটনা ঘটে। বাংলাদেশের কয়েকজন নাগরিক স্বাধীনতার পর পরই দিল্লীতে ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গিয়েছিলেন বাংলাদেশকে একটা প্রদেশ হিসেবে ভারতভুক্ত করে নেবার আবেদন নিয়ে। এ ঘটনারও একটা ছোট্ট বিবরণ দিয়েছেন দিল্লীতে বাংলাদেশের তদানীন্তন মিশন প্রধান হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী।

উপরে উল্লেখিত সাক্ষাৎকারেই তিনি বলেন : "মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত ছিল। সেই সূত্রে প্রধানমন্ত্রীর (ইন্দিরা গান্ধীর) ব্যক্তিগত স্টাফদের সঙ্গে আমার হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। প্রধানমন্ত্রীর এক ব্যক্তিগত স্টাফ আমাকে ২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৭১-এ আমাকে জানান যে, আগের দিন অর্থাৎ ২৮শে ডিসেম্বর তিনজন সংখ্যালঘু

www.pathagar.com

নেতা, যাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন সুতার ছিলেন একজন (আওয়ামী লীগ এমপি), প্রধানমন্ত্রীর সাথে দেখা করেন। তাঁরা তাঁর কাছে বাংলাদশকে ভারতের অংশ করে রাখার প্রস্তাব করেন। প্রধানমন্ত্রীর ওই ব্যক্তিগত স্টাফ সেই সময় সেখানে ছিলেন। তিনিই ওই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেন।

পরে আমি বাংলাদেশে সরকারকে বিষয়টি অবহিত করি। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয় না। তারা কিছু সংখ্যালঘু নেতা চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে সিকিম ধরনের ভারতীয় অংশ করতে।"[৪]

যারা সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে বিক্রির জন্যে দিল্লী গিয়েছিলেন, তাদের মত বাংলাদেশের শত্রুরাই বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারকে অধীনতামূলক চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করেছিল। এই স্বাধীনতা বিরোধিতা এখনও আছে।

এদের স্বাধীনতা-বিরোধিতার একটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত হিসাবে শাহরিয়ার কবীরের তৎপরতার উল্লেখ করা যায়। ঘটনাটি ঘটে ২২শে নবেম্বর ২০০১ সালে। তিনি সেদিন কলকাতা থেকে ঢাকা ফেরার পথে ঢাকা বিমানবন্দরে ষড়যন্ত্রমূলক ডকুমেন্টসহ ধরা পড়েন। এই ডকুমেন্টগুলোর মধ্যে ছিল ৪টি ভিডিও ক্যাসেট, ১টি ডিএইচএস ভিডিও ক্যাসেট, ১০টি অডিও ক্যাসেট এবং ৩টি সিডি, যেগুলোতে রয়েছে নানা স্পর্শকাতর তথ্য। ২৬ নবেম্বর, ২০০১ সালের এক রিপোর্টে দৈনিক মানবজমিন এ সম্পর্কে লিখে, "তার (শাহরিয়ার কবীরের) ক্যাসেটে কলকাতাস্থ বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদের ব্যানারে বিভিন্ন মিছিলের চিত্র রয়েছে। সূত্র মতে, বৃহত্তর বরিশাল, যশোর, খুলনা ও ফরিদপুরের বেশ কিছু লোক পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থী শিবির গড়ে তোলে। কলকাতাস্থ নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের অঙ্গ সংগঠন বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ। শাহরিয়ার নির্মিত ক্যাসেটে আপত্তিকর, চাঞ্চল্যকর ও দেশদ্রোহিতার তথ্য নিয়ে গোয়েন্দারা মাঠে নেমেছেন। .... নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের সভাপতি হলেন 'চিত্তরঞ্জন সুতার (ইনি স্বাধীনতার পর দিল্লী গিয়েছিলেন বাংলাদেশকে ভারতভুক্ত করার আবেদন

জামায়াত স্বাধীনতার অজেয় বর্ম ইসলামের আন্তরিক ধারক বলেই দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় এই স্তম্ভের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। শাহরিয়ার কবীর এবং তাদের বাইরের দোসরদের কাছে এটাই জামায়াতের মূল অপরাধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি বর্ম হওয়াকেই জামায়াতের অপরাধ ধরছে শাহরিয়ার কবীররা। আর শাহরিয়ার কবীর চিত্ত সুতাররা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বলেই তারা জামায়াতে ইসলামীরও বৈরী।

www.pathagar.com

নিয়ে)। তিনি আওয়ামী লীগের সাবেক সংসদ সদস্য। গোয়েন্দা সূত্র জানায়, একটি বিদেশী গোয়েন্দা সংস্থা প্রায় ১ কোটি টাকার বিনিময়ে ক্যাসেট তৈরী ও 'পূর্ণিমা' নামের (সংখ্যালঘু নির্যাতন বিষয়ক) একটি ছবি তৈরির ক্ষেত্রে শাহরিয়ার কবীরকে বেছে নেয়। শাহরিয়ার কবীরের ক্যাসেটে স্বাধীন বঙ্গভূমি সম্পর্কে বেশ কিছু নতুন নতুন তথ্য মিলেছে। তাদের ভাষ্য, খুলনা, যশোর, বরিশাল ও ফরিদপুরকে নিয়ে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রে ভারতের বাংলাদেশ উদ্বাস্তু কল্যাণ পরিষদ ও নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ কাজ করে যাচ্ছে। তাদের শ্লোগান 'সীমারেখা মানছি না, মানবোনা।' ক্যাসেটে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া সম্বলিত হয়েছে। সেখানে আরও বলা হয়েছে, সীমারেখা সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ সমস্যা দূর করতে বঙ্গভূমির কোন বিকল্প নেই।"

শাহরিয়ার কবীরের এই অপরাধ বাংলাদেশ দণ্ডবিধির ১২৩-ক এবং ১২৪-ক ধারা অনুসারে শাস্তিযোগ্য গুরুতর রাষ্ট্রদ্রোহমূলক অপরাধ। কিন্তু তিনি ২১ জানুয়ারি ২০০২ সালে হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন। তারপর আর তাকে বিচারের কাঠগড়ায় ফিরতে হয়নি। আওয়ামীবলয়ের গোটা শক্তি, তার সাথে বাইরের কিছু তৎপরতা সংঘবদ্ধভাবে তার বিচারের পথে বাধার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং বিচার কাজ সামনে এগুবে না, এটাই সত্য। এমন কারণেই বাংলাদেশকে ভারতভুক্ত করার আবেদন নিয়ে বাংলাদেশী যারা দিল্লী গিয়েছিল তাদেরও বিচার হয়নি।

স্বাধীনতা-উত্তর দীর্ঘ ৩৬ বছরে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে এই ধরনের স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ আসেনি, যা এসেছে শাহ-রিয়ার কবীর ও চিত্ত সুতারদের বিরুদ্ধে। কিন্তু ট্রাজেডি হলো, স্বাধীনতার শত্রু এই শাহরিয়ার কবীর ও চিত্ত সুতাররাই জামায়াতে ইসলামীকে স্বাধীনতা বিরোধী বলেন। ব্যাপারটা চোরের চোর চোর বলে চিৎকার করার মত। বিনা কারণে জামায়াতের সাথে শাহরিয়ার কবীরদের এই বৈরিতা কেন? কারণ হলো, শত্রুর মিত্র শত্রুই হয়। সময় সাক্ষি, সকল বিচারে জামায়াত দেশপ্রেমিক শক্তি-বলয়ের একটা বড় স্তম্ভ। জামায়াত স্বাধীনতার অজেয় বর্ম ইসলামের আন্তরিক ধারক বলেই দেশের স্বাধীনতা রক্ষায় এই স্তম্ভের বিশেষ অবস্থান রয়েছে। শাহরিয়ার কবীর এবং তাদের বাইরের দোসরদের কাছে এটাই জামায়াতের মূল অপরাধ। বাংলাদেশের স্বাধীনতার একটি বর্ম হওয়াকেই জামায়াতের অপরাধ ধরছে শাহ-রিয়ার কবীররা। আর শাহরিয়ার কবীর চিত্ত সুতাররা বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বলেই তারা জামায়াতে ইসলামীরও বৈরী। #

তথ্য সূত্র ঃ

১। 'Document of India-Bangladesh-Pakistan Relation', The Sub-continent, An Information Service of India Publication, Page- 43-44.
২। ঐ, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮।
৩। 'সাক্ষাতকার', হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী, 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ', মাসুদুল হক, পৃষ্ঠা ১২৫, ১২৬। ৪। ঐ, পৃষ্ঠা ১২৩।

[অত্র নিবন্ধটি ০৭ নভেম্বর ২০০৭, তারিখে দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত হয় - সম্পাদক।]

www.pathagar.com

কাদের বিচারের কথা কারা বলছে?

মন্তব্য প্রতিবেদন - দৈনিক ইত্তেফাক

দুর্নীতির বিচারে দৃঢ়তা দেখিয়ে বর্তমান সরকার যে সময়ে ঘরে-বাইরে সুনাম অর্জন করে চলেছে ঠিক সেই মুহূর্তে একটি বিশেষ মহল জনগণের দৃষ্টিকে সুকৌশলে অন্য দিকে সরিয়ে দেয়ার জন্যে একাত্তরের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করার দাবি তুলে পানি ঘোলা করতে উঠে পড়ে লেগেছেন। এই দাবি গণফোরামের নেতা ড. কামাল হোসেনকে রাখতে দেখে অনেকেই অবাক হচ্ছেন। কারণ, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না হওয়ার বিষয়টি তিনি অন্য অনেকের চাইতে বেশী অবহিত রয়েছেন। ইতিবৃত্তে তাকালে দেখা যায়, ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতার দ্বিতীয় বিজয় বার্ষিকীতে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আওতায় মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী বন্দীদের একটা বড় অংশ মুক্তি পায়। ওই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় বলা হয়েছিল, যাদের বিরুদ্ধে দালালির সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে তারা এর আওতায় আসবে না। সমগ্র দেশের বিভিন্ন জেল থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার। যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা ১০১৫ থেকে কমিয়ে করা হয় ১৯৫। তাদের বিচার হয়নি। যদিও প্রকাশ্য জনসভায় বাংলার মাটিতে তাদের বিচার করার ঘোষণা দিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু স্বয়ং। কিন্তু এ ঘোষণা ঘোষণাই থেকে যায়। কারণ, ১৯৭৪ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ, ভারত এবং পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক বৈঠকে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তির ১৪ এবং ১৫ ধারার অধীনে এই বিচার রহিত করা হয়। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল তৎকালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর কামাল হোসেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমেদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সে চুক্তির আলোচ্য দু'টি ধারা নিচে উল্লেখ করা হল।

ধারা ১৪ ঃ

এ সম্পর্কে তিন মন্ত্রী উল্লেখ করেন, বিরোধ মীমাংসায় অটলভাবে কাজ করে যাওয়ার তিন দেশের অঙ্গীকারের আলোকে বিষয়টির পর্যালোচনা হওয়া উচিত। মন্ত্রীরা আরো উল্লেখ করেন যে, স্বীকৃতি দানের পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সফর করবেন এবং বন্ধুত্ব স্থাপনের লক্ষ্যে অতীতের ভুলভ্রান্তিকে ক্ষমা ও ভুলে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। একইভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পরিচালিত নৃশংসতা এবং ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে তিনি চান যে, জনগণ অতীত ভুলে যাবে, এবং নতুন করে শুরু করবে এবং বাংলাদেশের জনগণ জানে কীভাবে ক্ষমা করতে হয়।

ধারা ১৫ :

পরিহার করার মনোভাবের আলোকে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অতীতকে ক্ষমা ও বিস্মৃত হবার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার অনুকম্পা হিসেবে বিচার কাজ না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে দিল্লী চুক্তির শর্তাধীনে পাকিস্তানে যুদ্ধ বন্দী প্রত্যার্পণের যে কাজ চলছে, তাদের সঙ্গে ১৯৫ জন যুদ্ধপরাধীকেও প্রত্যাপর্ণ করা যেতে পারে।

দেখা যাচ্ছে স্বাধীনতার অব্যবহিত পরের বাংলাদেশে যারা নেতৃত্বে ছিলেন তারা ভারতের সঙ্গে শান্তি, সমঝোতা ও বন্ধুত্বের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যুদ্ধাপরাধের বিচার পরিহার করেছিলেন। তখনকার রাজনীতিতে বিশেষ করে যে প্রেক্ষাপটে আমরা স্বাধীনতা অর্জন করেছি তাতে এ ধরনের চুক্তির যৌক্তিকতা যে কোন বিবেচক মানুষ স্বীকার করবেন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের প্রথম হাইকমিশনার ও ভারতের সাবেক পররাষ্ট্র সচিব জেএন দীক্ষিত 'লিবারেশন এণ্ড বিয়ণ্ড' গ্রন্থে দাবি করেছেন, ১৯৭২ সালের জুনে শেখ মুজিব তৎকালীন ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পরমেশ্বর নারায়ণ হাকসারের সঙ্গে আলোচনায় সকল পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দিদের পাকিস্তানকে ফেরত দিতে রাজি হন এবং আভাস দেন যে, তিনি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারে আগ্রহী নন। মুজিব এই আপস করেছিলেন পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে তার মতে, ৪৪০ জন যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা পর্যায়ক্রমে ১৯৫ থেকে ১১৮ জনে নামিয়ে আনা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ১১৮ জনের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় তথ্যপ্রমাণ সংগ্রহে বাংলাদেশ সরকার গড়িমসি করে।

এ সম্পর্কে জানা যায়, মূলত ভারতের অনাগ্রহের কারণেই বাংলাদেশ পাক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারেনি। তবে ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের মধ্যে এনিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছিল। শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী বিচার চেয়েছিলেন। তার সিনিয়র উপদেষ্টা ডিপি ধরও সকল বন্দিকে ছেড়ে দেয়ার পক্ষে ছিলেন না। ১৯৭৩ সালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রশ্নে দু'দেশের মধ্যে অব্যাহত আলোচনার এক পর্যায়ে তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব এনায়েত করিম দিল্লিতে যান। জানা যায়, ওই সময়ে পিএন হাকসার স্পষ্ট ভাষায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলকে বলেন, কোন পেশাদার

www.pathagar.com

আর্মি অপর পেশাদার আর্মির বিচার আশা করেনা- ভারতের সেনাবাহিনী এই যুক্তিতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চায়না। ভারতের অনাগ্রহের অবশ্য অন্য কারণও ছিল বলে অনেকে মনে করেন। ১৯৭২ সালের জুলাই মাসে স্বাক্ষরিত সিমলা চুক্তিকালেই ভারত বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, যুদ্ধাপরাধীদের কোন বিচার হবে না এবং সকল বন্দিকে ফেরত দেয়া হবে।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পর তার কন্যা শেখ হাসিনাও বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তিনিও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের জন্য কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। মূল আসামীর বিচার না করে দালাল বা সহযোগীদের বিচার করতে চাওয়া আইনের চোখে কতটা যুক্তিযুক্ত সে প্রশ্ন সচেতন মহল সঙ্গত কারণেই তুলতে পারেন। এই বিচার এতদনি যারা করেননি তাদের পক্ষ থেকে যখন এ দাবি তোলা হয় তখন তার উদ্দেশ্য নিয়ে সবার মনে প্রশ্ন জাগে বৈকি! তারা যদি রাজনৈতিক নেতা না হতেন, কখনো ক্ষমতায় না থাকতেন তাহলে এ দাবিকে সহজভাবে গ্রহণ করতে কারও অসুবিধা ছিল না। বর্তমান সরকারের কাছে জনগণের প্রত্যাশা অনেক। সেই প্রত্যাশাসমূহের মধ্যে এই দাবিকেও একটি উত্তম প্রত্যাশা হিসাবে দেখা যেত।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে তারা যদি সত্যি আন্তরিক হতেন তবে তাদের ব্যর্থতার জন্য আগে জাতির কাছে ক্ষমা চাইতেন তারা। আসলে এক শ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা আছেন যারা সবসময় সাধারণ মানুষকে আহাম্মক মনে করে থাকেন। তারা মনে করেন, জনগণের স্মৃতিশক্তি ক্ষীন। তারা অতীতকে ভুলে যায়। অতীতে কারা গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে, বিচারকদের নিয়োগ, বদলি ও বরখাস্তের ক্ষমতা হাতের মুঠোয় নিয়েছে, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ করেছে তাদের কীর্তিগাঁথা এদেশের মানুষ ভুলে যায়নি। নিজেদের ভুল-ত্রুটি ও ব্যর্থতার জন্য নেতারা যদি অনুতপ্ত হতে শেখেন তাহলে সেটাই হবে দেশ, জাতি ও জনগণের জন্য কল্যাণকর। আমরা রাজনীতিবিদদের কাছ থেকে দায়িত্বশীল নেতৃত্ব প্রত্যাশা করি। জাতিও সুন্দর ভবিষ্যতের কথা শুনতে আগ্রহী। অতীতের ব্যর্থতার কথা ধামাচাপা না দেয়াই হবে জাতির জন্য মঙ্গলজনক। বর্তমান সরকারের মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে প্রতিবন্ধকতা ও বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা না করাই ভাল। আশার কথা এই যে, বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার কোনভাবেই এই ফাঁদে পা দিচ্ছে না। #

[প্রতিবেদনটি দৈনিক ইত্তেফাকে ০৬ নভেম্বর ২০০৭-এ প্রকাশিত হয় - সম্পাদক।]

www.pathagar.com

রুঢ় বাস্তব এবং আইন-কানুনের আলোকে জনাব মুজাহিদের মন্তব্যের বিশ্লেষণ

আসিফ আরসালান

একটি কথা স্বীকার করতেই হবে যে ধর্মনিরপেক্ষ এবং বামপন্থী শিবির প্রচার প্রপাগান্ডায় ওস্তাদ। কোন সময় কোন প্রপাগান্ডা চালাতে হবে, কোন কথা বলে কাকে ঘায়েল করা যাবে, কখন কোন ইস্যু সৃষ্টি করতে হবে, এই বিষয়গুলোতে তাদের রয়েছে বিশেষজ্ঞ জ্ঞান। আমার তো মনে হয় কোন সময় কাকে রাজনৈতিক মার দিতে হবে, এই বিষয়ে তাদের যতখানি জ্ঞান রয়েছে অন্যদের ততখানি আছে বলে মনে হয় না। অবশ্য জাতীয়তাবাদী এবং ইসলামী শিবির দলগুলোর যে এসব বিষয়ে কোনো জ্ঞান নাই, সেটা নয়। আসল ব্যাপার হলো সেক্যুলার ও জাতীয়তাবাদী দুই ঘরানার মধ্যে সবচেয়ে বড় যে প্রভেদ সেটি হলো নীতির প্রশ্ন। জামায়াতে ইসলামী তথা দেশের ইসলামী দলগুলোকে নিয়ে আজ যে খেলা শুরু হয়েছে তার প্রকৃতি এবং সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য জামায়াত এবং সমমনারা ঠিকই ধরতে পেরেছেন। কিন্তু রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের জন্য প্রতিপক্ষ শিবির যত নিচে নামতে পারে জামায়াত ততো নিচে নামতে পারে না। প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য সেক্যুলার ক্যাম্প কোনো নীতি নৈতিকতার ধার ধারে না। ক্ষমতায় যাওয়ার জন্য ওরা প্রতিপক্ষের বুকে ছুরি বসাতেও পিছপা হয় না। কিন্তু জামায়াত বা বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদীরা রাজনৈতিক অঙ্গনেও নীতি-নৈতিকতা মেনে চলে। পত্র-পত্রিকা এবং টেলিভিশনে তারা ডাঁহা মিথ্যা কথা বলতে পারে না। যুদ্ধাপরাধী, মুক্তিযুদ্ধ, স্বাধীনতার পক্ষ বা বিপক্ষ শক্তি এসব ইস্যুতে আমাদের কথা আরেকবার অক্ষরে অক্ষরে সত্য বলে প্রমাণিত হল।

জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে ইলেকশন কমিশনের সাথে বৈঠক শেষে বেরিয়ে আসলে সাংবাদিকরা কিছু বলার জন্য তাঁকে ছেকে ধরেন। তখন তিনি বলেন যে নির্বাচন কমিশনের সাথে তারা সংশ্লিষ্ট অনেক বিষয় আলোচনা করেছেন। তখন তাকে নির্দিষ্টভাবে প্রশ্ন করা হয় যে 'যুদ্ধাপরাধী', 'ধর্মভিত্তিক রাজনীতি' বন্ধ করার প্রভৃতি বিষয়ে তার মতামত কি? উত্তরে তিনি বলেন যে, সংবিধানে ধর্মভিত্তিক

www.pathagar.com

রাজনীতির বিধান রয়েছে সেখানে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ সংবিধানের পরিপন্থী। তিনি আরো বলেন যে তৎকালীন সরকার ১৯৫ জন পাকিস্তানী সৈন্যকে যুদ্ধাপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করেছিল এবং তাদের বিচার করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু তাদের একজনেরও বিচার করা হয়নি। ৯৩ হাজার পাকিস্তানী সৈন্যের সকলকেই ছেড়ে দেয়া হয়েছে এবং তারা সকলেই পাকিস্তান ফিরে গিয়েছে। তারপর এ পর্যন্ত কাউকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি। সুতরাং ধরে নিতে হবে যে, দেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই। জনাব মুজাহিদ আরো বলেন যে, তৎকালীন সরকার দালাল আইন জারী করে এবং সেই সরকারই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে। দেশে স্বাধীনতার বিপক্ষে কেউ নাই। জনাব মুজাহিদ সাংবাদিকদের সামনে যা বলেছেন তার অগ্র-পশ্চাৎ উদ্ধৃত না করে মাত্র ৩/৪টি শব্দ সেখান থেকে তুলে এনে সারাদেশকে অশান্ত করার উস্কানি শুরু হয়েছে। আমরা আজকের আলোচনার শুরুতেই বলেছি যে সেক্যুলার এবং বামপন্থী শিবির অপপ্রচার এবং রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের চরিত্র হননে ওস্তাদ। কখন, কোথায় কাকে কিভাবে ঘায়েল করতে হবে সেই সেন্স অব টাইমিং তাদের এ্যাকুইরেট।

ওদের টার্গেট আগামী নির্বাচন সেই নির্বাচনে ওরা ফাঁকা মাঠে গোল দিতে চায়। ওরা জানে যে অবাধ, মুক্ত ও ভীতিহীন, পরিবেশে নির্বাচন হলে রহস্যপূর্ণ স্থান থেকে ভুয়া ভোটার আমদানী না করলে নির্বাচনে জয়লাভ করার কোনো সম্ভাবনা ওদের নাই। তাই ওরা ওদের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে শারীরিক ও রাজনৈতিকভাবে দাবিয়ে রেখে ফাঁকা মাঠে গোল করতে চায়। তাই বিগত জোট সরকারের প্রধান দুই স্তম্ভ বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামী এখন ওদের টার্গেটে পরিণত হয়েছে। বিএনপি দেশের বৃহত্তম রাজনৈতিক দল হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ কারণে কোণঠাসা এবং পঙ্গু। কি কারণে কোণঠাসা, কি কারণে পঙ্গু, সে ব্যাপারে আঁটি ভেঙ্গে শাঁস দেয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না। বিএনপির শীর্ষনেতা

(১) হত্যা, (২) ধর্ষণ, (৩) লুটপাট এবং (৪) অগ্নিসংযোগ। এই ৪ ধরনের অপরাধে যারা অভিযুক্ত তাদেরকে যুদ্ধাপরাধের আওতায় আনা হবে এবং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। আগেই বলেছি যে দালাল আইন জারি ছিল ১ বছর ১০ মাস ৬ দিন। সময়টি একেবারে কম নয়। এই দীর্ঘ সময় তৎকালীন সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মধ্যে ১ জনের বিরুদ্ধেও উপরোক্ত ৪ ধরনের অভিযোগের কোনো একটি অভিযোগও আনা হয়নি এবং সেই অভিযোগে কাউকেও গ্রেফতার করা হয়নি। এই সব অভিযোগে কারো বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করা হয়নি।

www.pathagar.com

বেগম খালেদা জিয়া থেকে শুরু করে প্রথম সারির প্রায় সমস্ত নেতা রাজবন্দী। হুলিয়া থাকায় অসংখ্য নেতাকর্মী পলাতক জীবনযাপন করছেন। যারা জেলের বাইরে আছেন অথবা আত্মগোপন করেননি তাদের মধ্যেও বিরোধের বীজ বপন করা হয়েছে। বিএনপি এখন আর দুই টুকরা নয়, তিন টুকরায় পরিণত হয়েছে। অধিকাংশ মিডিয়া আওয়ামীবান্ধব এবং বিএনপির প্রতি বৈরী। দোষে গুণেই মানুষ। কোনো সরকার বা তাদের অধিকাংশ মন্ত্রী দুর্নীতি এবং ভুলত্রুটির উর্ধ্বে থাকতে পারে না। বিএনপিও পারেনি। বিএনপির আগের আমলে অর্থাৎ শেখ হাসিনার প্রধানমন্ত্রীত্বের আমলে আওয়ামী লীগও দুর্নীতি এবং ভুল চুকের উর্ধ্বে ছিল না। কিন্তু আমাদের মিডিয়া আওয়ামীবান্ধব হওয়ায় তৎকালীন আওয়ামী সরকারের ভুলত্রুটি এবং দুর্নীতি ততোখানি হাইলাইট করেনি। পক্ষান্তরে বিএনপি তথা ৪ দলীয় জোটের পান থেকে চুন খসলেই দেশের ৭৫ শতাংশ পত্রপত্রিকা বিএনপির ত্রুটিবিচ্যুতি এবং দুর্নীতিকে 'অডিট অব প্রোপোরশন' প্রচার করা হয়েছে। জামায়াতের বিরুদ্ধে ওরা বিগত ৩৭ বছর ধরে ডাহা মিথ্যা ও উস্কানিমূলক বক্তব্য প্রচার করে যাচ্ছে। করতে করতে পরিস্থিতি বর্তমান পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই পটভূমিতে এবার ধরা হয়েছে জামায়াতকে।

অথচ এসব অভিযোগ যদি কেউ করে থাকে তাহলে একমাত্র তাকেই, অর্থাৎ সেই অপরাধীকেই যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। দেখা যাচ্ছে যে ঐ ১ বছর ১০ মাস ৬ দিনে ঐসব অভিযোগে কোনো মামলা দায়ের হয়নি। এরপর ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে দালাল আইন বিলোপ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ৩০শে নভেম্বরর পর থেকে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাস এই মধ্যবর্তী ২ বছর ১ মাস সময়ের মধ্যে ঐ ৪টি অভিযোগে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা হয়নি। এরপর আরো ৩১ বছর গত হয়েছে।

দুই

আসুন বিষয়টি নিরাসক্ত মনে পর্যালোচনা করি। এ সংক্রান্ত তথ্য এবং বক্তব্য অতীতে অনেকবার লেখা হয়েছে। কিন্তু যারা জেগে জেগে ঘুমায় তাদের ঘুম ভাঙ্গানোর সাধ্য নাই কারো। তবে অতীত সব সময় কথা কয়ে ওঠে এবং সেটি সত্যি কথাই হয়। ১৯৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারী 'বাংলাদেশ দালাল আইন' জারি করা হয়। এই আইনের তিনটি সংশোধন করা হয়। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর অপর একটি সরকারি ফরমানে দালাল আইনে সাজা প্রাপ্ত এবং বিচারাধীন সকল আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। সুতরাং দালাল আইনের মাধ্যমে যাদেরকে মুক্তি

www.pathagar.com

সংগ্রাম বিরোধী কার্যকলাপ অথবা মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক সরকারকে সহযোগিতা করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল তাদের সকলকেই ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। যারা দালাল আইন কলেবরেটরের সংজ্ঞায় পড়ে তাদেরকেই আওয়ামী লীগ স্বাধীনতা বিরোধী বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছিল। কিন্তু সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর শুধুমাত্র অভিযুক্তরাই নয়, যাদের সাজা হয়েছিল তারাও ক্ষমার আওতায় পড়ে এবং তাদেরকে মুক্তি দেয়া হয়। ৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ তারিখে তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে ৩১ অক্টোবর ১৯৭৩ পর্যন্ত দালাল অধ্যাদেশে অভিযুক্ত মোট ৩৭ হাজার ৪শ ৭১ জনের মধ্যে ২ হাজার ৮শ' ৪৮ জনের মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিল। এরমধ্যে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল ৭শ' ৫২ জন। বাকি ২ হাজার ৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। এর মধ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় মাত্র একজন রাজাকারকে। (তথ্য সূত্র : 'একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়' প্রকাশক মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র')। এই পুস্ত কাটিকেই ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি এতদিন ধরে তাদের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ডকুমেন্ট হিসেবে আখ্যায়িত করে এসেছে। তাদের তথ্য অনুযায়ী, বিচার করার পর মাত্র একজন রাজাকারকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। তার নাম চিকন আলী। দেখা যাচ্ছে যে দালালির সন্দেহে প্রায় এক লাখ লোককে গ্রেফতার করলেও অভিযোগ আনা সম্ভব হয় ৩৭ হাজার ৪শ' ৭১ জনের বিরুদ্ধে। এদের মধ্যে ৩৪ হাজার ৬শ' ২৩ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলেও উপযুক্ত সাক্ষ্য প্রমাণের অভাবে কোনো মামলাই দায়ের করা সম্ভব হয়নি। অবশিষ্ট যে ২ হাজার ৮শ' ৪৮ জনের বিচার হয় সেই বিচারে মাত্র ৭শ' ৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। এই ৭শ' ৫২ জন ছাড়া ২ হাজার ৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। যে ৭শ' ৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় তাদের অভিযোগও গুরুদণ্ড দেয়ার মত গুরুতর ছিল না। ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয় তখন চিকন আলী এই দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। একমাত্র চিকন আলী ছাড়া অবশিষ্ট ৩৭ হাজার ৪শ' ৭০ ব্যক্তি মুক্ত নাগরিক হয়ে বেরিয়ে আসে। এরপর আর কেউ কি দালাল থাকে? আর যদি দালালই কেউ না থাকে তাহলে স্বাধীনতা বিরোধী থাকে কোথায়? সুতরাং সাবেক মন্ত্রী এবং জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ যখন বলেন যে বাংলাদেশে কোনো স্বাধীনতা বিরোধী নেই, তখন তিনি ভুল বলেন কিভাবে? মুজাহিদের এই বক্তব্য নিয়ে সারাদেশে যে উত্তেজনা-সৃষ্টি করা হচ্ছে তার পেছনে নৈতিক বা আইনগত কোনো ভিত্তি নেই। এটি সম্পূর্ণ রাজনীতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত।

তিন

দালাল আইন জারি করা হয়েছিল ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারী। পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী আত্মসমর্পণ করে ১৬ ডিসেম্বর। শেখ মুজিব স্বদেশ ফিরে আসেন

www.pathagar.com

তার ২৫ দিন পর ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী। এরপর ১৪ দিনের মাথায় ২৪ শে জানুয়ারী দালাল আইন জারি করা হয়। তখন সারাদেশে একদিকে বিরাজ করছিল বিজয়ের আনন্দ, অন্যদিকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সুতীব্র উত্তেজনা। ১ বছর ১০ মাস ৬ দিন পর যখন সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয় তখন বলা হয় যে ৪ ধরনের অপরাধ এই ক্ষমার আওতায় পড়বে না।

এগুলো হল : (১) হত্যা, (২) ধর্ষণ, (৩) লুটপাট এবং (৪) অগ্নিসংযোগ। এই ৪ ধরনের অপরাধে যারা অভিযুক্ত তাদেরকে যুদ্ধাপরাধের আওতায় আনা হবে এবং যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। আগেই বলেছি যে দালাল আইন জারি ছিল ১ বছর ১০ মাস ৬ দিন। সময়টি একেবারে কম নয়। এই দীর্ঘ সময় তৎকালীন সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মধ্যে ১ জনের বিরুদ্ধেও উপরোক্ত ৪ ধরনের অভিযোগের কোনো একটি অভিযোগও আনা হয়নি এবং সেই অভিযোগে কাউকেও গ্রেফতার করা হয়নি। এই সব অভিযোগে কারো বিরুদ্ধে একটি মামলাও দায়ের করা হয়নি। অথচ এসব অভিযোগ যদি কেউ করে থাকে তাহলে একমাত্র তাকেই, অর্থাৎ সেই অপরাধীকেই যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। দেখা যাচ্ছে যে ঐ ১ বছর ১০ মাস ৬ দিনে ঐসব অভিযোগে কোনো মামলা দায়ের হয়নি। এরপর ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি মাসে মরহুম প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের আমলে দালাল আইন বিলোপ করা হয়। ১৯৭৩ সালের ৩০শে নভেম্বরর পর থেকে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাস এই মধ্যবর্তী ২ বছর ১ মাস সময়ের মধ্যে ঐ ৪টি অভিযোগে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো মামলা করা হয়নি। এরপর আরো ৩১ বছর গত হয়েছে।

এখন ২০০৭ সালের নভেম্বর মাস। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই ৩৭ বছরেও ঐসব অভিযোগে কারো বিরুদ্ধে কোনো মামলা হয়নি, কিংবা ঐসব অভিযোগে কাউকে গ্রেফতার করা হয়নি। অভিযোগ যদি না থাকে, মামলা যদি না থাকে তাহলে কোনো ব্যক্তিকে যুদ্ধাপরাধী বলা হবে কোন যুক্তিতে? বা কোন মাপকাঠিতে? সাবেক মন্ত্রী জামায়াতের সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ আইনের নিক্তিতে এবং যুক্তিতর্কের কষ্টি পাথরে বলেছেন যে বাংলাদেশে কোনো যুদ্ধাপরাধী নেই। আইনের দৃষ্টিতে জনাব মুজাহিদ ভুল বললেন কিভাবে? সেই বিষয় নিয়ে যেভাবে উত্তেজনা ছড়ানো হচ্ছে সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বললে ভুল বলা হবে কি?

তবে এ ব্যাপারে প্রধান উপদেষ্টা ড. ফখরুদ্দীন আহমদের মন্তব্যকে সঠিক বলে মনে হয়। তিনি বলেছেন, যদি কারো বিরুদ্ধে কারো কাছে ঐসব অপরাধের প্রমাণ থাকে তাহলে তিনি আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। আইনের দরজা তার জন্য খোলা এর চেয়ে আদর্শ সমাধান আর কি হতে পারে?

[নিবন্ধটি ০৪ নভেম্বর ২০০৭, দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকায় প্রকাশিত হয় - সম্পাদক।]

www.pathagar.com

বর্তমান বাস্তবতা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি

সৈয়দ আবুল মকসুদ

সময়ের এক ফোঁড় অসময়ের দশ ফোঁড়- কথাটি বাঙালির নয়, এটি ইউরোপ থেকে এসেছে: আ স্টিচ ইন টাইম সেভস নাইন। বাংলা প্রবাদ হওয়া উচিত ছিল : সময়ে একটি ফোঁড়ও নয়, কিন্তু অসময়ে হাজার ফোঁড়। কথাটি মনে হচ্ছে কয়েক দিন ধরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ধর্মপন্থী রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার দাবিগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে। আরেকটি প্রবচনের কথা বাঙালি একেবারেই বিবেচনায় আনতে চায় না, তা হলো: ভাবিয়া করিয়ো কাজ করিয়া ভাবিয়ো না। এটিও বহিরাগত : লুক বিফোর ইউ লিপ। যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবিতে এমন সব মানুষ কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছেন, তাতে মনে হচ্ছে যেকোনো দিন গোলাম আযমও এ দাবিতে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি দেবেন।

যুদ্ধাপরাধী ও রাষ্ট্রবিরোধীর মধ্যে বিরাট পার্থক্য। পরাজিত পক্ষ আত্মসমর্থন করলে যুদ্ধবন্দী হয়। সব যুদ্ধবন্দী যুদ্ধাপরাধী নয়। যুদ্ধবন্দীরা জেনেভা কনভেনশন অনুযায়ী মানবিক আচরণ পায়। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হয় অথবা ক্ষমা করা হয়। যুদ্ধাপরাধী নিয়াজি, রাও ফরমান আলিদের ভারত সরকার ক্ষমা করে দিয়েছে।

একাত্তরে বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় যারা বিরোধিতা করেছিল, তারা 'রাষ্ট্রবিরোধী', 'দেশদ্রোহী'। দেশদ্রোহিতার অপরাধ কঠিন অপরাধ। সে অপরাধে শুধু একাত্তরের ঘাতকদের নয়, পরবর্তীকালের কোনো রাষ্ট্রবিরোধীরও বিচার সম্ভব। যারা একাত্তরে খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ করেছিল, তাদের বিচার করে প্রচলিত আইনে মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া যায়। তবে তা হতে হবে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায়; প্রতিহিংসামূলকভাবে নয়।

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়ে যারা খুন, ধর্ষণ ও অন্যান্য অপরাধে লিপ্ত ছিল, তাদের সংখ্যা হাজার হাজার; কিন্তু একজন রাজাকারও ফাঁসির দড়ি গলায় পরেনি- সে এক ভয়াবহ বিস্ময়কর ব্যাপার। কেন একজন অপরাধীকেও

www.pathagar.com

প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা গেল না- সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো কেউ নেই। খুনির ফাঁসি দেওয়ার জন্য আমাদের দেশে আইন-আদালত সব সময়ই ছিল। তা সত্ত্বেও অপরাধীরা ছাড় পেল কীভাবে?

পাকিস্তানি কারাগার থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দেন, তাতে তিনি বলেন : 'ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে যারা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে, তাদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদের বিচার হবে। সে ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখুন।'

শেষ বাক্যটি তিনি বলেছিলেন এ জন্য যে তিনি বিমানবন্দরে নেমেই শুনেছিলেন, অনেকেই প্রতিহিংসার বশে আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছিল। কাদের সিদ্দিকী প্রকাশ্যে পল্টন ময়দানে স্বাধীনতাবিরোধী বাঙালি, বিহারি প্রভৃতিকে গুলি করে হত্যার যে জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তাতে বাংলাদেশ সরকারের ভাবমূর্তি বর্হিবিশ্বে চূর্ণ হয়ে যায়। সে জন্য অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দেওয়ার ভার তিনি সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতার একজন প্রধান নেতা মওলানা ভাসানী। স্বাধীনতাবিরোধী অপরাধীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা তিনি কলকাতা থেকেও বলেছেন, দেশে ফিরে এসেও বলেছেন। ১৯৭২ সালের ৩০ এপ্রিল তিনি শিবপুর কৃষক সম্মেলনে তাঁর ভাষণে বহু জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারের সঙ্গে বলেন : 'এই দেশের স্বাধীনতাসংগ্রামে যারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, যারা বিট্রে করেছে, তাদের নাম সন্ধান করে, উপযুক্ত কমিটি নিয়োগ করে- যে কমিটির প্রধান পরিচালক হবেন হাইকোর্টের একজন যোগ্যতম জজ-বিচারের পর যারা দোষী সাব্যস্ত হবে, তাদের নাম ভোটার লিস্ট হতে বাদ দিতে হবে।'

বাহাত্তরের ৯-১০ ডিসেম্বর সন্তোষে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির যে জাতীয় সম্মেলন হয়, তাতে এক প্রস্তাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল : 'পার্টি উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিতেছে যে বাংলাদেশ সরকার ও তাহার প্রধানমন্ত্রী প্রথম দিন হইতেই পাকিস্তানি যুদ্ধ অপরাধীদের বিচারের কথা বলিয়া আসিলেও উক্ত ব্যাপারে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই। সকল যুদ্ধবন্দীই ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে এবং যুদ্ধবন্দীদের বাংলাদেশে ফিরাইয়া আনার কোনো ইচ্ছা বা কার্যক্রম দেখা যাইতেছে না। শাসক দল যত ঘোষণাই করুক না কেন, প্রকৃতপক্ষে ভারত সরকারই উক্ত যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে যেকোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের মালিক। ... যুদ্ধাপরাধীরা বাংলাদেশের চরম গণহত্যার জন্য দায়ী। তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিবার কোনো এক্তিয়ার বাংলাদেশের জনগণ সরকারকে দেয় নাই।'

গণহত্যার নায়কদের বিচারের জোর দাবি মওলানা ভাসানী অব্যাহতভাবে করেছেন। তিনি পাকিস্তানপন্থী রাজনীতিকদের ৩০ বছর নির্বাচনে অংশগ্রহণে

www.pathagar.com

নিষেধাজ্ঞারও দাবি করেন। কিন্তু কোনো যুদ্ধাপরাধী ও তাদের দালালদের বিচার না হওয়ার মূল কারণ অনেক মন্ত্রী, সাংসদ, নেতা ও বীর উত্তম মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানিদের সহযোগী ছিল। তাদের বাঁচাতে গিয়ে সকলকেই বাঁচিয়ে দেওয়া হয়।

সেক্টর কমান্ডার ও বীর উত্তম মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে জাতির প্রত্যাশা ছিল অনেক। তাঁরা কি বলতে পারবেন, সে প্রত্যাশার এক শতাংশও তাঁরা পূরণ করেছেন ৩৬ বছরে? মন্ত্রিত্ব, রাষ্ট্রদূত বা উচ্চ সরকারি চাকরি, জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া, প্রকাণ্ড ব্যবসা-বাণিজ্য করা দোষের কিছু নয়। ওগুলো করেও জাতির স্বার্থে কিছু কাজ করা যায়। কয়েক দিন ধরে দেখছি, অনেকেই গোলটেবিলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে জোর বক্তব্য দিচ্ছেন। কিন্তু তাঁরা এত দিন কোথায় ছিলেন? এ দাবি আগে যাঁরা তুলেছেন যেমন কাজী নূরউজ্জামান (বীর উত্তম), তাঁদের তো তাঁরা সহযোগিতা দেননি। তাঁরা তো এ দাবি নিজের থেকেও তোলেননি। আওয়ামী লীগ তুলেছে বলে তাঁরা তুলেছেন। আওয়ামী লীগও নিজের থেকে তোলেনি। কাদের সিদ্দিকী, জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টি তুলেছে বলে আওয়ামী লীগ তুলেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যদি জিল্লুর রহমান সাহেবের নিজের মনের দাবি হতো, তাহলে যেদিন তাঁর দল বিচারপতি এ কে এম নূরুল ইসলামকে নমিনেশন দেয়, সেদিন তিনি পদত্যাগ করতেন। বিচারপতি ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের না পাকিস্তানের পক্ষের সে খবর এই বর্ষীয়ান আওয়ামী লীগ নেতার নিশ্চয়ই অজানা নয়।

একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের পর যে দল ক্ষমতাসীন হয়, তার এক নম্বর কর্তব্য ছিল যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানিদের দালাল ও অপরাধীদের গ্রেফতার করা এবং বিচারের মুখোমুখি করা। এটি তাদেরই দায়িত্ব, অন্য কোনো পরবর্তী সরকারের নয়। এ ক্ষেত্রে তারা মোটেই কোনো কাজ করেনি, তা-ও নয়। বাহাত্তরের ২৪ জানুয়ারি জারি করা হয় দ্য বাংলাদেশ কলাবরেটরস (স্পেশাল ট্রাইব্যুনালস) অর্ডার, ১৯৭২। ওটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আইন ছিল না, তা ছিল পাকিস্তানের যেসব দালাল সহযোগী হত্যা, খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত ছিল, তাদের বিচারের আইন। এক সদস্যের স্পেশাল ট্রাইব্যুনালও গঠিত হয়েছিল দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজের নেতৃত্বে। হাজার পঞ্চাশেক অপরাধীকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। দালাল আইন দু-তিনবার অ্যামেন্ডমেন্ট বা সংশোধন করা হয় ১৯৭২ সালের ১ জুন ও ২৯ আগস্ট।

দালাল আইনের ভালো-মন্দ দিক নিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময়ই বিতর্ক হয়েছিল। এ আইনের অপ্রয়োগ হতে পারে, সে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন সে সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবীরা। তাদের মধ্যে মাওলানা ভাসানী, মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান,

www.pathagar.com

আবুল ফজল, বিচারপতি এস এম মোর্শেদ, আলীম আল রাজী, এনায়েতুল্লাহ খান প্রমুখ ছিলেন। বঙ্গবন্ধু নিজেও বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। সে জন্য এক পর্যায়ে তিনি সাধারণ ক্ষমাই ঘোষণা করেন। তবে খুন, ধর্ষণের সুনির্দিষ্ট অপরাধীদের তিনি ক্ষমা করেননি।

দালাল আইন ও সংবিধানের মৌলিক অধিকার নিয়ে ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন, যিনি ১৯৭৩ এ আওয়ামী লীগের টিকিটে সাংসদ নির্বাচিত হন, প্রশ্ন তুলে তাঁর পত্রিকায় লিখেছিলেন : 'শাসনতন্ত্রের প্রথম সিডিউলে বর্ণিত অপরাপর আইনসহ দালাল আইনকে মৌলিক অধিকারসমূহের আওতাবহির্ভূত করা হয়েছে। দালালদের বিচার ও শাস্তি প্রদানের জন্য এই আইনটি বলবৎ রাখার প্রয়োজনীয়তা আছে। দালাল আইনের সাথে মৌলিক অধিকারের সংঘর্ষ অবধারিত। কিন্তু দালাল আইনে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠনের নির্দিষ্ট সময়সীমার উল্লেখ না থাকায় ক্রমাগতভাবে এই আইনের অপব্যবহার হওয়ার আশঙ্কা আছে। এই আইন বলে কারো বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ ভিত্তিহীন হলেও তিনি মৌলিক অধিকার ও শাসনতন্ত্রের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হবেন। সাড়ে ছয় কোটি বাঙালি, যারা সীমান্ত অতিক্রম করেনি, তাদের প্রত্যেকেই দালাল- এ কথা চিন্তা করেন এমন কিছুসংখ্যক লোকও সমাজে রয়েছে। যদি খারাপ ধরনের লোক ক্ষমতায় আসেন, তাহলে তারা এই আইনকে অত্যাচার-উৎপীড়নের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহারের প্রয়াস পাবেন। পরবর্তী সরকারসমূহ প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক কর্মীকে হয়রানি করার জন্য এই আইন বলবৎ রাখতে প্রলুব্ধ হতে পারে। ৪৭ অনুচ্ছেদ মোতাবেক এই আইনকে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পরিবর্তন-সংশোধনের নামে আরো কঠোর করারও অবকাশ রয়েছে। আমার মতে, দালাল আইনে কারো বিরুদ্ধে ব্যবস্থা দায়ের করার সময়সীমা নির্ধারণ না করার বিচ্যুতি ভবিষ্যতে সুষ্ঠু রাজনীতি নিশ্চিত করার স্বার্থেই শোধরানো উচিত ছিল। (ইত্তেফাক, ১৯ নভেম্বর ১৯৭২) আমার অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, লেখাটি ইত্তেফাকে

মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানিদের পক্ষ নিয়ে যারা খুন, ধর্ষণ ও অন্যান্য অপরাধে লিপ্ত ছিল, তাদের সংখ্যা হাজার হাজার; কিন্তু একজন রাজাকারও ফাঁসির দড়ি গলায় পরেনি- সে এক ভয়াবহ বিস্ময়কর ব্যাপার। কেন একজন অপরাধীকেও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা গেল না- সে প্রশ্নের জবাব দেওয়ার মতো কেউ নেই।

www.pathagar.com

প্রকাশের পর বঙ্গবন্ধু মনোযোগ দিয়ে পড়েছিলেন। ওই দিন তিনি গণভবনে তাঁর ঘনিষ্ঠ সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনাও করেন। দালালদের ব্যাপারে তিনি যতটা সম্ভব নমনীয় হওয়ার চেষ্টা করেন। দালাল আইন নিয়ে বেশ কিছু মামলা-মকদ্দমাও হাইকোর্টে ১৯৭২-৭৫ এ হয়েছিল। বিচারপতি কে এম সোবহানের কোর্টে লুৎফর মৃধা বনাম রাষ্ট্র, বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরী, বিচারপতি কামালউদ্দিন হোসেইন, বিচারপতি রুহুল ইসলাম ও অন্যান্য বিচারপতির কোর্টে মায়মুননেসা বনাম রাষ্ট্র, মশিউর রহমান যাদু মিঞা বনাম রাষ্ট্র, আবদুর রহমান বকুল বনাম রাষ্ট্র, এ কে এম নাজমুল হুদা বনাম রাষ্ট্র, হাফেজ মওলানা নুরুদ্দিন বনাম রাষ্ট্র প্রভৃতি মামলা ছিল দালাল ও মৌলিক অধিকারবিষয়ক।

দালাল প্রশ্ন সমাধানে বঙ্গবন্ধুর সময় যথেষ্ট কাজ হয়েছে। তবে ১৯৭৫ পর্যন্ত স্বাধীনতার পক্ষ এবং পাকিস্তানি দালালদের মধ্যে একটি বিভাজনরেখা ছিল। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা ও বীর উত্তম জিয়াউর রহমানের সরকার যেদিন কাজী জাফরের নেতৃত্বে শিক্ষা কমিশন গঠন করে সেদিন মুক্তিযোদ্ধা ও রাজাকারের স্বাধীনতাসংগ্রামী ও স্বাধীনতাবিরোধীদের পার্থক্য সম্পূর্ণ ঘুচে গেল। ওই কমিশনে মাওলানা মান্নানও ছিলেন, জাহানারা ইমামও ছিলেন। এসব তথ্যে যারা বিব্রত করছেন, তাঁদের রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি : সত্যরে লও সহজে।

এখনকার পত্রিকা পড়লে মনে হবে, শুধু মুসলিম লীগ, জামায়াত বা নেজামে ইসলামীর লোকেরাই পাকিস্তানিদের দালাল ছিল। বস্তুত সব শ্রেণী ও গোষ্ঠীর মধ্যেই পাকিস্তানীদের সহযোগী ছিল। আবদুল হক তাঁর কমিউনিস্ট পার্টির নামের সঙ্গে বাংলাদেশ হওয়ার পরও 'পূর্ব পাকিস্তানই রেখে দেন। অত্যন্ত 'প্রগতিশীল' বুদ্ধিজীবীদের কেউ কেউ পাকিস্তানিদের সহযোগিতা করেছেন। ১৬ ডিসেম্বর দেশ শত্রুমুক্ত না হলে, আর বছরখানেক টিক্কা খাঁরা বাংলাদেশ দখল করে রাখলে অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিকে আজ মানুষ ভিন্ন পরিচয়ে জানত।

আওয়ামী লীগ সবচেয়ে বড় দলের একটি এবং তার নেতৃত্বেই দেশ স্বাধীন হয়েছে; সুতরাং তার দায়িত্ব বেশি হওয়ার কথা। আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জিল্লুর রহমান কয়েক দিন ধরে বলছেন, 'যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের সময় এখনই' 'তত্ত্বাবধায়ক সরকারের যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কাজটি এখনই শুরু করা উচিত', যুদ্ধাপরাধী ও ধর্মাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িক দলগুলোকে নিবন্ধন না দেওয়া প্রভৃতি।

মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের বিরুদ্ধে বিএনপি কোনো দিনই কোনো ব্যবস্থা নেবে না এবং তা সমর্থনও করবে না। কারণ, তাদের মধ্যে প্রণয় এমন গভীর যে একসঙ্গে জোট বাঁধুক বা না বাঁধুক ক্ষমতায় যাক বা না যাক- কোনো দিনই তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে না। যাবতীয় প্রতিক্রিয়াশীল কাজ বিএনপি বুক ফুলিয়ে করে। অন্যদিকে আওয়ামীলীগ তার নিজের কর্মসূচি নিজে বাস্তবায়ন না করে অন্যকে দিয়ে করাতে চায়- যে কাজটি আওয়ামী লীগ নয়টি বছর ক্ষমতায় থেকে করেনি, তা করার দায়িত্ব হস্তান্তর করছে নয় মাস বয়সী সরকারকে। জাতির জনকের

www.pathagar.com

মর্যাদাপ্রাপ্তিসহ যেসব কাজের দায়িত্ব আওয়ামী লীগ নেতারা বর্তমান সরকারের কাছে অর্পণ করছেন, তা সম্পন্ন করতে এ সরকারকে ২৭ বছর সময় দিতে হবে। কেউ দিলে সরকার সানন্দে সে সময় নেবে, তবে জনগণ তত দিন চুপ করে বসে থাকবে কি না?

দেশপ্রেমিকদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চান, তাঁরা বলছেন, দালালদের এ দেশে থাকার অধিকার নেই, তাদের এক্ষুনি ফাঁসি দিতে হবে, দালালদের প্রশ্নে সমস্ত জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ। এসব উক্তির অর্থ বোঝার সাধ্য আমার মতো মানুষের নেই। কোনো যুদ্ধে বিজয়ী শক্তির দায়িত্ব বিরাট। ক্ষমা করার ক্ষমতা শুধু বিজয়ী শক্তিরই থাকে- পরাজিতদের নয়। জাতি যদি আজ সত্যি ঐক্যবদ্ধ থাকত, তাহলে এর চেহারা হতো অন্য রকম; বিশ্বে মর্যাদা হতো অনেক উঁচুতে। দেশ আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে যদি আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করি, তাহলে ১৪ কোটি মানুষের জীবনে নেমে আসবে অমানিশার অন্ধকার।

দালাল ও স্বাধীনতাবিরোধীদের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু যে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন, সেখান থেকে আবার পেছনের দিকে যাওয়ার সম্ভব হবে না। কোনো সরকারের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। তিনি যাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন, তাদের আবার আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না। বিচার মানে আইনের প্যাচের মধ্যে যাওয়া; সেখানে সাক্ষীসাবুদ, আসামি-ফরিয়াদি, জেরা-পাল্টা জেরা থাকবে। ৩৬ বছর পর অনেক কিছু প্রমাণ করা কঠিন। নাৎসি বাহিনীর সদস্য কুট ওয়ার্ল্ডহেইম জাতিসংঘের মহাসচিব ও পরে অষ্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট হন। গুণ্টার গ্রাস তাঁর অপরাধ স্বীকার করেন এবং মূলধারার সঙ্গেই আছেন।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার একটি মৌলিক প্রশ্ন; একাত্তরে যারা খুন, ধর্ষণ করেছে, সেই অপরাধীদের বিচার আরেকটি প্রশ্ন; পাকিস্তানপন্থীদের নির্বাচনে অংশগ্রহণে নিষেধাজ্ঞা আরোপ একটি ভিন্ন প্রশ্ন এবং ধর্মপন্থী, বিশেষত ইসলামপন্থী রাজনীতি বন্ধের দাবি সম্পূর্ণ আরেকটি বিষয়। এই সবগুলোকে যাঁরা একাকার করে ফেলেছেন, তারা বিবেচনাপ্রসূত কাজ করছেন না।

বাংলাদেশের বর্তমান বাস্তবতাটি কী তা অন্ধ ও বধির এবং মানসিক ভারসাম্যহীন ব্যক্তি ছাড়া যেকোনো সুস্থ মানুষের অজানা নয়। অর্থনীতি বিপর্যস্ত, খাদ্যদ্রব্যের মূল্য পাঁচ হাজার বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ এবং প্রতিদিন বাড়ছে, তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ করে সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো বন্ধ রেখে হাজার হাজার শিক্ষার্থীর জীবন থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে একটি বছর, কৃষিক্ষেত্রে বিপর্যয়-আগামী বছর ভাত জুটবে কি না কেউ জানে না, শিল্প-শ্রমিক বেকার, আন্তর্জাতিক চাপ ও চক্রান্ত সর্বকালের মধ্যে এখন সর্বাধিক, জাতির টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও অস্তিত্ব রক্ষার সব দায়দায়িত্ব তত্ত্বাবধায়ক সরকার ও যৌথ বাহিনীর হতে ছেড়ে দিয়ে অবসরপ্রাপ্ত দেশপ্রেমিকেরা শুধু গোলটেবিল বৈঠক করলে জাতির সর্বনাশ অবধারিত। # *(লেখক ; গবেষক, প্রাবন্ধিক ও কলাম লেখক)*

[এ নিবন্ধটি দৈনিক প্রথম আলোয় ১৩ নভেম্বর ২০০৭-তারিখে প্রকাশিত হয়- সম্পাদক।]

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবির নেপথ্যে

ড. মাহ্‌বুব উল্লাহ্‌

জরুরি অবস্থা বলবৎ থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক আবহাওয়া উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। রক্তপাত, হানাহানি ও গৃহযুদ্ধের বিভীষিকা এড়াতেই গত ১১ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেন। দুর্ভাগ্যের বিষয়, রক্তপাত ও হানাহানি সাময়িকভাবে ছাইচাপা পড়লেও আবারো তার অশুভ ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণের দাবিতে রাজনীতির আসর আবারো সরগরম হয়ে উঠেছে। রাজধানী ঢাকায় সীমিত আকারে ঘরোয়া রাজনীতির সুযোগ ব্যবহার করে গোলটেবিল বৈঠক ও বক্তৃতা-বিবৃতির ভাষা ক্রমাগত মারমুখী হয়ে উঠেছে। এমনিতেই তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনেকটা স্বউদ্যোগে নিজস্ব এজেন্ডার সংখ্যা বাড়িয়ে ফেলেছে। বাংলাদেশ এমন একটি দেশ যেখানে হাজারো রকমের কাজ করার আছে। কিন্তু এগুলোর কতটুকু করা সম্ভব এবং কী সময়ের মধ্যে করা যাবে সেই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা অনেক সময়ই কর্মসূচি নির্ধারণ করার সময় বিবেচনা করা হয় না। এছাড়া এগুলো করার জন্য প্রয়োজনীয় সামর্থ্য ও সম্পদ আছে কিনা সেটিও বিবেচনায় নেয়া হয় না। এই যখন অবস্থা তখন কিছু রাজনৈতিক দল এবং তাদের সহযোগী বুদ্ধিজীবীরা আরো কিছু কর্মসূচি গ্রহণের জন্য সরকারের ওপর অবিরাম চাপ প্রয়োগ করে চলেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার কর্মসূচি হাতে নেয়ার জন্য সরকারের ওপর বাড়তি চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। প্রধান উপদেষ্টা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিতময় উক্তিকে দাবি উত্থাপনকারীরা নিজেদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠার কাজে ব্যবহার করছে। অন্যদিকে উপদেষ্টা ব্যারিস্টার মইনুল হোসেনের এ সংক্রান্ত উক্তি দাবি উত্থাপনকারীদের ক্ষোভ ও উষ্মা প্রকাশের বাহানা তৈরি করেছে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধকরণ- দাবি দুটির মধ্যে প্রথমটির যৌক্তিকতা থাকলেও বাস্তবতা সম্পর্কে প্রশ্ন আছে। দ্বিতীয় দাবিটি নিতান্তই অযৌক্তি ও অগণতান্ত্রিক। গত ৩৬ বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এসব দাবি বিশেষ বিশেষ সময়ে উচ্চকিত হয়ে উঠেছে এবং দাবির আড়ালে গোপন করা রাখা এজেন্ডা বাস্তবায়িত হয়ে যাওয়ার পর নিস্তব্ধ হয়ে

www.pathagar.com

গেছে। ৩০ মে ১৯৮১ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান একদল বিপথগামী সেনা অফিসারের ব্যর্থ অভ্যুত্থানে চট্টগ্রাম সার্কিট হাউসে শাহাদতবরণ করেন। জিয়াউর রহমানের শাহাদতবরণের পূর্ববর্তী দিনগুলোতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করে মুক্তিযোদ্ধা সংসদ রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়। অনেকে মনে করেন, জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে সামরিক অভ্যুত্থানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতেই এই অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়েছিল। জিয়াউর রহমানের শাহাদতবরণের পর এ ধরনের দাবি দীর্ঘদিন উত্থাপিত হয়নি। ১৯৯১-এর নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয়। আওয়ামী লীগের কাছে নির্বাচনের এই ফলাফল ছিল সব কল্পনা ও ভাবনার অতীত। আওয়ামী লীগ ভেবেছিল তারা তাদের সাংস্কৃতিক সহযোগী এবং নিজস্ব সাংগঠনিক শক্তির বলে যেভাবে নির্বাচন প্রচার জমিয়ে তুলেছে তার ফলে তাদেরই নিরঙ্কুশভাবে জয়ী হওয়ার কথা। বিএনপি তখন একটি অসংগঠিত দল। দলটির একমাত্র ভরসা ছিল এর সম্মোহনী শক্তির অধিকারী নেত্রী বেগম খালেদা জিয়া। কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী যে প্রবণতা দলটিকে বিজয়ের মর্যাদা দান করে সেটি হলো এদেশবাসীর জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা। বিএনপির বিজয় আওয়ামী লীগকে তড়িতাহত করলেও অপ্রস্তুত অবস্থায় ফেলতে পারেনি। কারণ আওয়ামী লীগের ইতিহাস দীর্ঘ এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টিতে এর কোনো জুড়ি নেই। প্রথমেই চট্টগ্রামের নেতা এবং পরবর্তীকালে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে শুরু হলো নবপ্রবর্তিত ভ্যাট বা মূল্য সংযোজন কর বিরোধী বিক্ষোভ আন্দোলন। এতেও যখন খুব একটা কাজ হলো না তখন দাঁড় করানো হলো জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি'। ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির ছত্রছায়ায় জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধবিরোধী সব বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী ও সংস্কৃতিসেবী একজোট হলো। নির্মূল কমিটির প্রতি শেখ হাসিনার সমর্থন নির্মূল কমিটিকে হিসাবে নেয়ার মতো শক্তিতে পরিণত করল। অস্বীকার করার উপায় নেই, ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি বাহিনীর সহযোগীরা জঘন্য মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড করেছে। তাদের কর্মকাণ্ডের বেদনাদায়ক ও ট্র্যাজিক স্মৃতি নিয়ে বাংলাদেশের শত শত পরিবার আজো বেঁচে আছে। এ কারণে নির্মূল কমিটি অনেক সহজ-সাল মানুষের সহানুভূতি ও সমর্থন পেতে সক্ষম হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার অধ্যাপক গোলাম আযমকে গ্রেফতারে বাধ্য হয়। অর্থাৎ যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি তুলে আওয়ামী লীগ ও নির্মূল কমিটি যা অর্জন করতে চেয়েছিল সেটি তারা অর্জন করতে সক্ষম হলো। জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটল এবং এরই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের দাবিতে ধ্বংসাত্মক, অসহযোগ আন্দোলন শুরু হলো। এই আন্দোলন মোকাবিলা করার

www.pathagar.com

জন্য বিএনপির আর কোনো মিত্র থাকল না। বিষয়ের বিষয় হলো 'ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি' যাদের বিচার দাবি করে আন্দোলন করেছিল আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য ধর্মনিরপেক্ষ দল তাদেরই সমর্থন পেল। আসলে আওয়ামী লীগ চেয়েছিল যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি করে বিএনপিকে একঘরে করে ফেলতে এবং পরবর্তী নির্বাচনে বিএনপির ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন প্রতিহত করতে। আওয়ামীলীগের স্ট্রাটেজি সফল হয়েছিল এবং ১৯৯৬-এর নির্বাচনে বিএনপি জাতীয় সংসদে বিরোধী দলের আসনে বসতে বাধ্য হয়। একুশ বছর পর আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় আসীন হলো। তারা পূর্ণ মেয়াদে ক্ষমতায় আসীন থাকল। কিন্তু যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করল না। রাজনীতিতে শঠতা ও ভণ্ডামির একটা ভূমিকা থাকে কিন্তু সেই শঠতা ও ভণ্ডামি এত কদর্য আকার ধারণ করতে পারে তা ভাবাও যায় না। এখন আবার বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নতুন করে দাবি তোলা হয়েছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হবে এবং ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে হবে। স্বভাবইত মনে শঙ্কা জাগে, এবার তাহলে কাকে শাহাদতবরণ করতে হবে, কাদের ক্ষমতা থেকে হটানো হবে।

যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে ঘরোয়া রাজনীতি যখন সরগরম ঠিক তখনি একটি সময়োপযোগী কলাম লিখেছেন লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ। ১৩ নভেম্বর ২০০৭ একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় মকসুদ সাহেবের কলামটি 'বর্তমান বাস্তবতা ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে। জনাব মকসুদ একজন প্রবীণ সাংবাদিক এবং প্রচুর লেখালেখি ও গবেষণা করেন। মোহন দাস করম চাঁদ গান্ধীর আদর্শের প্রতি তার গভীর আস্থা। গান্ধীকে নিয়েও তিনি গবেষণা করেছেন। তার সব মতামতের সঙ্গে একমত না হওয়া গেলেও কোনো কোনো ক্ষেত্রে একমত না হয়ে পারা যায় না। তিনি লিখেছেন, "পাকিস্তানি কারাগার থেকে প্রত্যাবর্তন করে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে যে ভাষণ দেন,

অর্থনীতিতে একটা সঙ্কট চলছে। উৎপাদন আমদানি রফতানি প্রভৃতির ওপর বিরূপ প্রভাব ছায়া ফেলেছে। যেসব তৎপরতা অনিশ্চয়তার জন্ম দেয় সেসব তৎপরতা অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্যও সুফল বয়ে আনে না।

www.pathagar.com

তাতে তিনি বলেন, ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে যারা সক্রিয়ভাবে সহায়তা করেছে তাদের বিরুদ্ধে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এদের বিচার হবে। সে ভার সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখুন।' শেষ বাক্যটি তিনি বলেছিলেন এ জন্য যে, তিনি বিমানবন্দরে নেমেই শুনেছিলেন, অনেকেই প্রতিহিংসার বশে আইন নিজের হাতে তুলে নিচ্ছিল। কাদের সিদ্দিকী প্রকাশ্যে পল্টন ময়দানে স্বাধীনতাবিরোধী বাঙালি, বিহারি প্রভৃতিকে গুলি করে হত্যার যে জঘন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন, তাতে বাংলাদেশ সরকারের ভাবমূর্তি বহির্বিশ্বে চূর্ণ হয়ে যায়। সে জন্য অপরাধীদের বিচার করে শাস্তি দেয়ার ভার তিনি সরকারের ওপর ন্যস্ত রাখেন"। অতি সাম্প্রতিক সময়ে কিছু সেক্টর কমান্ডার ও বীরোত্তম মুক্তিযোদ্ধা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবি করে মুখর হয়ে উঠেছেন। এদের সম্পর্কে বলতে গিয়ে মকসুদ সাহেব লিখেছেন, 'সেক্টর কমান্ডার ও বীরোত্তম মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে জাতির প্রত্যাশা ছিল অনেক। তাঁরা কি বলতে পারবেন, সে প্রত্যাশা এক শতাংশও তাঁরা পূরণ করেছেন ৩৬ বছরে? মন্ত্রিত্ব, রাষ্ট্রদূত বা উচ্চ সরকারি চাকরি, জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়া, প্রকাণ্ড ব্যবসা-বাণিজ্য করা দোষের কিছু নয়। এগুলো করেও জাতির স্বার্থে কিছু কাজ করা যায়। কয়েকদিন ধরে দেখছি, অনেকেই গোলটেবিলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ব্যাপারে জোর বক্তব্য দিচ্ছেন কিন্তু তাঁরা এতোদিন কোথায় ছিলেন? এ দাবি আগে যাঁরা তুলেছেন (যেমন কাজী নুরুজ্জামান বীরোত্তম) তাদের তো তারা সহযোগিতা দেননি। তাঁরা তো এ দাবি নিজের থেকেও তোলেননি। আওয়ামী লীগ তুলেছে বলে তারা তুলেছেন। আওয়ামী লীগও নিজের থেকে তোলেনি। কাদের সিদ্দিকী, জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টি তুলেছে বলে আওয়ামী লীগ তুলেছে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার যদি জিল্লুর রহমান সাহেবের নিজের মনের দাবি হতো, তাহলে যেদিন তাঁর দল বিচারপতি এ কে এম নুরুল ইসলমাকে নমিনেশন দেয়, সেদিন তিনি পদত্যাগ করতেন। বিচারপতি ইসলাম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের না পাকিস্তানের পক্ষের সে খবর এই বর্ষীয়ান আওয়ামী লীগ নেতার নিশ্চয়ই অজ না নয়।

সুতরাং নেতিবাচক রাজনীতি পরিহার করে কী করে সবার সমবেত প্রচেষ্টায় দেশটিকে একটি ইতিবাচক গতিমুখী রাখা যায় সেকথাই ভাবতে হবে। কীভাবে দেশটিকে অতিদ্রুত একটি নির্বাচিত সরকার উপহার দেয়া যায় সে কথাই এখন ভাবতে হবে সবাই মিলে।

www.pathagar.com

১৯৭২ সালের দালাল আইন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে জনাব মকসুদ লিখেছেন,"একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বরের পর যে দল ক্ষমতাসীন হয়; তার এক নম্বর কর্তব্য ছিল যুদ্ধাপরাধী, পাকিস্তানিদের দালাল ও অপরাধীদের গ্রেফতার করা এবং বিচারের মুখোমুখি করা। এটি তাদেরই দায়িত্ব, অন্য কোনো পরবর্তী সরকারের নয়। এক্ষেত্রে তারা মোটেই কোনো কাজ করেনি তাও নয়।' ৭২-এর ২৪ জানুয়ারি জারি করা হয় 'দ্য বাংলাদেশ কলাবরেটর্স (স্পেশাল ট্রাইব্যুনালস) অর্ডার ১৯৭২'। ওটি যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের আইন ছিল না, তা ছিল পাকিস্তানিদের যেসব দালাল-সহযোগী হত্যা,খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ প্রভৃতির সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের বিচারের আইন। এক সদস্যের স্পেশাল ট্রাইব্যুনালও গঠিত হয়েছিল দায়রা জজ ও অতিরিক্ত দায়রা জজের নেতৃত্বে। হাজার পঞ্চাশেক অপরাধীকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল। দালাল আইন দু-তিনবার অ্যামেন্ডমেন্ট বা সংশোধন করা হয় ১৯৭২ সালের ১ জুন ও ২৯ আগস্ট। দালাল আইনের ভালোমন্দ দিক নিয়ে বাংলাদেশের সংবিধান প্রণয়নের সময়ই বিতর্ক হয়েছিল। এই আইনের অপপ্রয়োগ হতে পারে। সে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছিলেন সে সময়ের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিজীবীরা। তাঁদের মধ্যে মওলানা ভাসানী, মাওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, আবুল মনসুর আহমদ, আতাউর রহমান খান, আবুল ফজল, বিচারপতি এসএম মোর্শেদ, আলীম আল রাজী, এনায়েতুল্লাহ খান প্রমুখ ছিলেন। বঙ্গবন্ধু নিজেও বিষয়টি গভীরভাবে অনুধাবন করেছেন। সেজন্য এক পর্যায়ে তিনি সাধারণ ক্ষমাই ঘোষণা করেন। তবে খুন, ধর্ষণের সুনির্দিষ্ট অপরাধীদের তিনি ক্ষমা করেননি।" শেখ মুজিবুর রহমান দালাল আইনের অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা বুঝতে পেরেই দালালদের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেছিলেন এই মূল্যায়নটি আংশিক। তার বিবেচনায় জাতীয় ঐক্যের প্রশ্নটিই গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করেছিল। ক্ষমা ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ক্ষমাপ্রাপ্তদের দেশবাসীর সঙ্গে এক জোট হয়ে দেশ গঠনের কাজে এগিয়ে আসারও আহবান জানিয়েছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক জাতীয়তাবাদী নেতাদের মতোই বিপরীতধর্মী রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিলেন। একদিকে পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে ভারতের সহানুভূতি ও সমর্থন তার কাম্য থাকলেও অন্যদিকে তিনি নতুন রাষ্ট্র বাংলাদেশের উদ্ভবের পর এর ওপর ভারতীয় আধিপত্য সন্তুষ্টচিত্তে গ্রহণ করতে পারেননি। পাকিস্তান সরকার তাকে মুক্তি দিয়ে লন্ডনে পাঠিয়ে দেয়। লন্ডন থেকে শেখ মুজিবের বাংলাদেশে ফেরার জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার ব্যক্তিগত উড়োজাহাজ 'রাজহংস' প্রেরণের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান বিনীতভাবে সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। অকল্পনীয় ইঙ্গিতময়তার মধ্য দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান জানিয়ে দিলেন, তিনি একটি স্বাধীন দেশের স্বাধীন নেতা। নতুন প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশের ওপর ভারতের আধিপত্য বিস্তারের একাধিক প্রয়াস শেখ মুজিবুর রহমানকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। রাজনীতিবিদের

www.pathagar.com

স্বভাবজাত চরিত্র অনুসারেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন এত বড় শক্তির মোকাবিলা জাতীয় ঐক্য ও সমঝোতা ছাড়া সম্ভব নয়। এ কারণেই তিনি যারা পাকিস্তানিদের সহযোগী ছিল (যারা মজ্জাগতভাবে ভারতবিরোধী) তাদেরও নৈতিক সমর্থন পেতে আগ্রহী ছিলেন। তার মধ্যকারএই দেশপ্রেম এ দেশের অনেক ভারতপন্থীর পছন্দ হয়নি। তারাই তাকে বিভ্রান্ত করে একদলীয় স্বৈরশাসনের বিপজ্জনক পথে পা বাড়াতে প্রলুব্ধ করেছিল। তারা চেয়েছিল তিনি যেন বুশ-ভারতের বলয়ে নিজেকে বন্দি করে রাখেন। এসব জাতিদ্রোহীই শেষ বিচারে শেখ মুজিবুর রহমানের ট্র্যাজিক মৃত্যুর জন্য দায়ী। আজ তারা ক্ষমতাসীনদের ঘাড়ে সওয়ার হওয়ার অপচেষ্টায় লিপ্ত। এদের কখনোই নিজ শক্তির বলে কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। পরজীবীর মতো অন্যের রক্ত চুষে বেঁচে থাকাতেই এরা অভ্যস্ত। সুতরাং সাধু সাবধান।

জনাব আবুল মকসুদ তার লেখায় একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। এই তথ্য অনুযায়ী জানা যায়, ১৯৭৬ সালে কাজী জাফর আহমদের নেতৃত্বে যে শিক্ষা কমিশন হয়েছিল সেই কমিশনের মরহুম মওলানা আবদুল মান্নান ও মরহুমা জাহানারা ইমাম দুজনেই সদস্যপদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। মাওলানা আবদুল মান্নান যে কমিশনের সদস্য সেই কমিশনে জাহানারা ইমাম কাজ করবেন না এমন কোনো কথা শোনা যায়নি কিংবা এরকম কমিশনের সদস্য জাহানারা ইমাম থাকতে চান না এমন কথাও শোনা যায়নি। জনাব আবুল মকসুদ, আরো লিখেছেন, 'দেশপ্রেমিকদের মধ্যে যাঁরা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চান, তাঁরা বলছেন, দালালদের এদেশে থাকার অধিকার নেই, তাদের এক্ষুণি ফাঁসি দিতে হবে, দালালদের প্রশ্নে সমস্ত জাতি আজ ঐক্যবদ্ধ। এসব উক্তির অর্থ বোঝার সাধ্য আমার মতো মানুষের নেই। কোনো যুদ্ধে বিজয়ী শক্তির দায়িত্ব বিরাট। ক্ষমা করার ক্ষমতা শুধু বিজয়ী শক্তিরই থাকে- পরাজিতদের নয়। জাতি যদি আজ সত্যি ঐক্যবদ্ধ থাকত, তাহলে এর চেহারা হতো অন্যরকম : বিশ্বে মর্যাদা হতো অনেক উঁচুতে। দেশ আজ যেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, সেখান থেকে যদি আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ভুল করি তাহলে ১৪ কোটি মানুষের জীবনে নেমে আসবে অমানিশার অন্ধকার। দালাল ও স্বাধীনতাবিরোধীদের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠাতা রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু যে সিদ্ধান্ত দিয়ে গেছেন, সেখান থেকে আবার পেছনের দিকে যাওয়া সম্ভব হবে না। কোনো সরকারের পক্ষেই তা সম্ভব নয়। তিনি যাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন তাদের আবার আসামির কাঠগড়ায় দাঁড় করানো যাবে না।'

১১ জানুয়ারির পর বাংলাদেশের ভিন্ন এক যাত্রা শুরু হয়েছে। এ যাত্রা থেকে পিছু হটা সম্ভব নয়। পুরনো ধাঁচের ষড়যন্ত্র, কলহ ও সংঘাতের রাজনীতি ও বস্তুতপক্ষে অকার্যকর হয়ে গেছে। রাজনীতিবিদদের এই সত্যটি অনুধাবন করতে হবে। রাজনীতিবিদরা মনে মনে অনেক কিছু বিশ্বাস করেন না, কিন্তু মুখে অনেক কথা

www.pathagar.com

আওড়ান। এ ধরনের শঠতা পরিহারের সময় এখনই। দেশে আজ অনেক সমস্যা। অর্থনীতিতে একটা সঙ্কট চলছে। উৎপাদন আমদানি রফতানি প্রভৃতির ওপর বিরূপ প্রভাব ছায়া ফেলেছে। যেসব তৎপরতা অনিশ্চয়তার জন্ম দেয় সেসব তৎপরতা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্যও সুফল বয়ে আনে না। সুতরাং নেতিবাচক রাজনীতি পরিহার করে কী করে সবার সমবেত প্রচেষ্টায় দেশটিকে একটি ইতিবাচক গতিমুখী রাখা যায় সেকথাই ভাবতে হবে। কীভাবে দেশটিকে অতিদ্রুত একটি নির্বাচিত সরকার উপহার দেয়া যায় সে কথাই এখন ভাবতে হবে সবাই মিলে। অনৈক্য, বিভ্রান্তি, হতাশা সৃষ্টি এবং অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টিতে যে কোনো ধরনের উস্কানি প্রদান দেশটিকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে পারে এবং পরিণামে যারা বাংলাদেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চায় তাদেরই অভিসন্ধি কার্যকর হবে। # *(লেখক : প্রফেসর, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)*

[দৈনিক আমার দেশ ১৫ নভেম্বর ২০০৭-এ অত্র নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়- সম্পাদক।]

www.pathagar.com

নিরপেক্ষতা হারাচ্ছে নির্বাচন কমিশন

ড. রেজোয়ান সিদ্দিকী

রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে নির্বাচন নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সংলাপ চলছে মাসাধিককাল ধরে। এই সংলাপ প্রক্রিয়ায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. এ টি এম শামসুল হুদা যেসব বক্তব্য দিচ্ছেন, তা ক্রমেই নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করছে। কোনো কিছু তলিয়ে না দেখেই হাটুরে স্লোগানের মতো 'যুদ্ধাপরাধীদের ঘৃণা করি,' 'তাদের নির্বাচনে অংশ নিতে দেয়া যায় না', 'সংবিধান সমুন্নত রাখার স্বার্থেই ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ হওয়া উচিত', প্রভৃতি বক্তব্য দিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নিজেকে দেশের রাজনৈতিক বিতর্কে জড়িয়ে ফেলছেন। এসব বিতর্ক বিষয়ের অনেক কিছুই শেষ হয়ে গেছে বহু আগেই। কোনো কোনো রাজনৈতিক দল খণ্ডিতভাবে সেসব প্রসঙ্গ উত্থাপন করে অহেতুক অপ্রয়োজনীয় রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিচ্ছেন, যার সাথে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, সম্মুখযাত্রা বা বাজার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের কোনো সম্পর্ক নেই। সেসব অযৌক্তিক বিতর্কে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ইতোমধ্যে পক্ষাবলম্বন করে তার নিরপেক্ষ অবস্থানকে নড়বড়ে করে ফেলেছেন।

শেখ মুজিব সরকারের আমলে স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতাকারী বলে আটককৃত ৩০ হাজার বন্দীকে ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করে মুক্তি দেয়া হয়েছিল। সে সময় প্রথমে যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১ হাজার ১৫। পরে চূড়ান্ত তালিকায় ১৯৫ জনকে যুদ্ধাপরাধী বলে ঘোষণা করা হয়। কিন্তু তাদের বিচার করা হয়নি। ১৯৭৪ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের এক বৈঠকে স্বাক্ষরিত সমঝোতা চুক্তি অনুযায়ী সেই বিচারও রহিত করা হয়। ১৯৭৪ সালের ৯ এপ্রিল বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং এবং পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমদ ওই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির ১৪ নম্বর ধারায় বলা হয় : 'এ সম্পর্কে তিন মন্ত্রী উল্লেখ করেন, বিরোধ মীমাংসায় অটলভাবে কাজ করে যাওয়ার তিন দেশের অঙ্গীকারের আলোকে বিষয়টি পর্যালোচনা হওয়া উচিত। মন্ত্রীরা আরো উল্লেখ

www.pathagar.com

করেন যে, স্বীকৃতিদানের পর পাকিস্তানের প্রধামন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সফর করবেন এবং বন্ধুত্ব স্থাপনের লক্ষ্যে অতীতের ভুল-ভ্রান্তিকে ক্ষমা ও ভুলে যাওয়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন। একইভাবে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পরিচালিত নৃশংসতা ও ধ্বংসযজ্ঞের ব্যাপারে তিনি চান যে, জনগণ অতীত ভুলে যাবে ও নতুন করে শুরু করবে এবং বাংলাদেশের জনগণ জানে, কী করে ক্ষমা করতে হয়।'

ওই চুক্তির ১৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে : 'পরিহার করার মনোভাবের আলোকে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি অতীতকে ক্ষমা ও বিস্মৃত হওয়ার পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকার অনুকম্পা হিসেবে বিচার কাজ না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সম্মত সিদ্ধান্ত হচ্ছে, দিল্লি চুক্তির শর্তাধীনে পাকিস্তানে যুদ্ধবন্দী প্রত্যর্পণের যে কাজ চলছে, তাদের সাথে ১৯৫ যুদ্ধাপরাধীকেও প্রত্যপর্ণ করা যেতে পারে। এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন শেখ মুজিব সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন। তিনিও এখন নতুন করে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার চাইছেন। অর্থাৎ এখন যাকে খুশি তাকে যুদ্ধাপরাধী ঘোষণা দিয়ে তার বিচার করতে হবে। রাজনৈতিক দলগুলো তো কত কথাই বলে। বলুক। কিন্তু সাংবিধানিক পদে অধিষ্ঠিত, নির্বাচনের গুরুদায়িত্ব পালনকারী প্রধান নির্বাচন কমিশনার যখন তাদের সুরে বগল বাজাতে শুরু করেন, তখন তাকে নিরপেক্ষ বলে মেনে নেয়া দুঃসাধ্য হবে বৈকি।

কিন্তু সিইসি সাহেবের হঠাৎ জরুরি প্রয়োজন পড়ল কেন সংস্কারবাদীদের বিএনপি বলে স্বীকৃতি দিতে? তিনি কেন ভুলে গেলেন বেগম খালেদা জিয়া আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী নন এবং তিনি কেন রায় দিতে গেলেন যে, বেগম খালেদা কার্যক্ষম নন-বোঝা গেল না।

গত ৪ নভেম্বর নির্বাচন কমিশনের সংলাপ ছিল আওয়ামী লীগের সাথে। সে সংলাপকালে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ড. শামসুল হুদা আওয়ামী লীগকে কাছে পেয়ে খুবই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তিনি বলেন, 'আওয়ামী লীগ শুধু রাজনৈতিক দল নয়, স্বাধীনতার অগ্রদূত। আপনারা মুজিবনগর সরকার গঠন করেছেন, মুক্তিযুদ্ধের

www.pathagar.com

নেতৃত্ব দিয়েছেন। তাই দেশের উন্নয়ন ও সব দায়-দায়িত্ব আপনাদের বহন করতে হবে।' তিনি বলেন, 'আপনাদের আন্দোলনের ফসল এই নির্বাচন কমিশন।' সিইসি'র আওয়ামী প্রীতির এই আবেগ-উচ্ছ্বাস তার হৃদয়ের ভেতরে থাকলে আমাদের হয়তো সংশয় হতো না। কিন্তু তিনি বড় খোলাখুলিভাবে হৃদয়ের কথা বলে ফেলেছেন সেদিক থেকে ১৯৯৬ সালের প্রধান উপদেষ্টা বিচারপতি হাবিবুর রহমান অনেক কুশলী ছিলেন। হৃদয়ের কথা তিনি মুখে প্রকাশ করেননি। কাজে প্রমাণ করে দিয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগ স্বাধীনতার অগ্রদূত- এই তকমা আওয়ামী কপালে এঁটে দেয়ার দায়িত্ব প্রধান নির্বাচন কমিশনারকে কে দিল? এ দেশে যারা স্বাধীনতাযুদ্ধ করেছেন, তার কত শতাংশ আওয়ামী লীগের সদস্য ছিলেন? প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে তার কি কোনো হিসাব আছে? কার্যত দলমত নির্বিশেষে সব শ্রেণীর মানুষ স্বাধীনতাযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, আওয়ামী লীগ একা নয়। আবেগাপ্লুত সিইসি সে কথা মনে রাখেননি। সিইসি ড. হুদা আরো বলেছেন, 'তাই এদেশের উন্নয়ন ও সব দায়িত্ব আপনাদের বহন করতে হবে।' প্রধান নির্বাচন কমিশনার যদি স্থিরসঙ্কল্প হয়েই থাকেন যে, এ দেশের সব দায়দায়িত্ব আওয়ামী লীগকে বহন করতে হবে, তা হলে আর এত ঝক্কি-ঝামেলার প্রয়োজন কী? সংলাপ, আইডি কার্ড, ব্যালট বাক্স-এসবের তো প্রয়োজন নেই। সরকার পরিচালনার দায়িত্বও সিইসি সাহেব আওয়ামী লীগকে দিয়ে দিলে পারেন। তারা তাদের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন। সিইসি সাহেব আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। তা হলো, আপনাদের আন্দোলনের ফসল এই নির্বাচন কমিশন। এবারো কোনো রাখঢাক করেননি সিইসি। আওয়ামী লীগ এই দাবিই ১-১১'র পর থেকে করে আসলিছল যে, এই সরকার তাদের আন্দোলনের ফসল। সুতরাং সরকার যেন কথা বুঝে চলে। সরকার অবশ্য খুব স্পষ্ট করে বলেনি, তারা আওয়ামী আন্দোলনের ফসল, না কি তাদের আসতে হলো আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রঘাতী

প্রধান নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য ইতোমধ্যেই তার নিরপেক্ষতা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে এবং মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, তিনি কোনো একটা এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। এ রকম অবস্থা চলতে থাকলে নির্বাচন কমিশন জনগণের আস্থা হারাতে বাধ্য। সে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলেই আমরা বরং খুশি হতাম।

www.pathagar.com

অরাজকতার মাথায় মুগুর মারতে। শেখ হাসিনাকে লন্ডন থেকে দেশে ফিরতে বাধা দেয়ার সময় সরকার স্পষ্ট বলেছিল যে, তথাকথিত আন্দোলনের নামে আওয়ামী লীগ দেশের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল এবং শেখ হাসিনা দেশে ফিরলে দেশ আবারো তেমন সর্বনাশের দিকে যেতে পারে। তবে নির্বাচন কমিশন তো আর সরকার নয়। নির্বাচন কমিশন একেবারে স্বাধীন। তাই সরকারের তোয়াক্কা তারা করেন না। সুতরাং সিইসি সাহেব নিজেকে আওয়ামী লীগের রাষ্ট্রঘাতী আন্দোলনের ফসল বলে মনে করেন। ক্ষমতার অমৃতের লোভে আওয়ামী লীগ যে বাংলাদেশ মন্থন করছিল তাতে অমৃত আসেনি। কিন্তু এমন হলাহল যে এসেছে, এখন তা স্পষ্ট হয়ে গেছে। সিইসি সাহেবের কথায় বোঝা গেল যে, আওয়ামী লীগ আন্দোলন করেছিল বলেই তিনি সিইসি হতে পেরেছেন। সুতরাং আওয়ামী লীগের প্রতি তার একটা আবেগ আছে না? আর সে আবেগের বশবর্তী হয়েই তিনি বলেই দিয়েছেন, দেশের সবদায়দায়িত্ব আওয়ামী লীগকেই বহন করতে হবে। সুতরাং এখানেও প্রশ্নবিদ্ধ সিইসি সাহেবের নিরপেক্ষতা।

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা আবারো প্রশ্নবিদ্ধ হলো বিএনপি'র সংস্কারবাদী নেতাদের প্রকৃত বিএনপি'র স্বীকৃতি দিয়ে। সে ক্ষেত্রে অনেকের মতে, কোনো যৌক্তিকতার ধার ধারলেন না প্রধান নির্বাচন কমিশনার। এসব বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে তার কণ্ঠে ৪ নভেম্বরের আবেগ আর শোনা গেল না। বরং শোনা গেল তাচ্ছিল্য আর ঘৃণার ধ্বনি।

সংস্কারবাদী হাফিজউদ্দিনের কাছে নির্বাচন কমিশনের চিঠি দেয়ার বিষয়ে ৫ নভেম্বর সাংবাদিকদের কমিশন সচিব জানান যে, বিএনপি'র গঠনতন্ত্রের আলোকেই অব. মেজর হাফিজকে চিঠি দেয়া হয়েছে। কিন্তু ৬ নভেম্বর প্রধান নির্বাচন কমিশনার ড. হুদা সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে বলেন, গঠনতন্ত্র নয়, 'ডকট্রিন অব নেসেসিটি' অনুসরণ করে বিএনপি'র সংস্কারপন্থী প্যানেলের অস্থায়ী মহাসচিব রিটায়ার্ড মেজর হাফিজউদ্দিন আহমদকে চিঠি দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, সব কিছু যে গঠনতন্ত্রে থাকবে, এমন কথা নেই। সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে রীতিপ্রথা এবং বিএনপি'র অতীত কর্মকাণ্ডও বিবেচনায় আনা হয়েছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার বিএনপি'র বহিষ্কৃত মহাসচিব মান্নান ভূঁইয়ার জন্য হৃদয় ভারাক্রান্ত করেছেন। বেগম খালেদা জিয়া তাকে ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত করেছেন। খালেদা জিয়া খারাপ!

বিএনপি'র গঠনতন্ত্রের ৫ (গ) ধারায় বলা হয়েছে : 'কোনো কারণে স্থায়ী কমিটির সভা আহ্বান সম্ভব না হলে জরুরী প্রয়োজনে দলের চেয়ারপারসন নিজ বিবেচনায় শাস্তিযোগ্য মনে করলে যেকোনো সদস্যের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং আগে নেয়া যেকোনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে পারবেন। তবে সব ক্ষেত্রে যথাশিগগির সম্ভব জাতীয় স্থায়ী কমিটির অনুমোদন নিতে হবে।

www.pathagar.com

চেয়ারপাসন অথবা স্থায়ী কমিটি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের আগে প্রয়োজনবোধে অভিযুক্তকে ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দিতে পারবেন।' এই ধারা অনুযায়ী চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া মান্নান ভূঁইয়া গংকে বহিষ্কার করেন। তাকে তিনি ব্যক্তিগত শুনানির সুযোগ দেয়ার প্রয়োজন মনে করেননি। তাতে সিইসি সাহেবের প্রাণটা কেন পোড়ায়, বোঝা গেল না। গঠনতন্ত্র নয়, সিইসি নিজেই দায়িত্ব নিয়ে ফেললেন কে হবেন বিএনপি'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, কে হবেন ভারপ্রাপ্ত মহাসচিব। দল কার প্রতি ন্যায়বিচার করেছে, কার প্রতি করেনি, সে রায় দিতে বসে গেছেন সিইসি। কারণ, সিইসির মতে, দলের চেয়ারপাসন বেগম খালেদা জিয়া এখন কারারুদ্ধ। তিনি কার্যক্ষম নন। এ অবস্থায় দল তো ভেঙে যেতে পারে না। সিইসি'র একটি দায়িত্ব আছে না!

কিন্তু সিইসি সাহেবের হঠাৎ জরুরি প্রয়োজন পড়ল কেন সংস্কারবাদীদের বিএনপি বলে স্বীকৃতি দিতে? তিনি কেন ভুলে গেলেন বেগম খালেদা জিয়া আইনের দৃষ্টিতে অপরাধী নন এবং তিনি কেন রায় দিতে গেলেন যে, বেগম খালেদা কার্যক্ষম নন-বোঝা গেল না।

প্রধান নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্ত ও বক্তব্য ইতোমধ্যেই তার নিরপেক্ষতা মারাত্মকভাবে ক্ষুণ্ন করেছে এবং মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, তিনি কোনো একটা এজেন্ডা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছেন। এ রকম অবস্থা চলতে থাকলে নির্বাচন কমিশন জনগণের আস্থা হারাতে বাধ্য। সে রকম পরিস্থিতি সৃষ্টি না হলেই আমরা বরং খুশি হতাম। # *(লেখক : সাংবাদিক, সাহিত্যিক)*

[দৈনিক নয়াদিগন্তে ২ নভেম্বর ২০০৭-এ নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়- সম্পাদক।]

www.pathagar.com

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িকতা

সরদার আব্দুস সাত্তার

আওয়ামী লীগসহ ১৪ দলীয় জোটের শরিক বামপন্থীরা দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিবন্ধন না করার দাবি জানিয়েছে নির্বাচন কমিশনের নিকট। এর আগে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছিল আ'লীগ ও বামপন্থী দলগুলো। অবশ্য আওয়ামী লীগ নেতারা কমুনিস্টদের চাপে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করা বা নিবন্ধনের বিরোধিতা করলেও ইতিপূর্বে তারা নির্বাচনী বৈতরণী পার হওয়ার জন্য ধর্মীয় দলের সঙ্গে নির্বাচনী জোট বেঁধেছিল। জামায়াতের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন করেছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আওয়ামী প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য গোলাম আযমের আশীর্বাদ ও তার পদধূলি নিতেও তার দ্বারস্থ হয়েছিল। নির্বাচনে জয় লাভের জন্য মাথায় কালো পট্টি ধারণ, হাতে তসবি নিয়ে ধর্ম নিরপেক্ষতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে পাকা রাস্তায় নামাজ আদায় করে দলীয় সভানেত্রী ইসলাম ভক্ত হয়েছেন।

আসলে আমাদের দেশে কেন সকল দেশেই রাজনীতিতে ধর্মের প্রভাব আছে। এর মধ্যে কোনো কোনো দেশে কপালে তিলক কাটা বা চন্দনের ফোঁটা দেয়া হয় আবার কোথায়ও মাথায় টুপি পরিধান করা হয়। আবার কোথাও কিছুই ব্যবহার করা হয় না। যিনি রাজনীতিক তিনি তো জনগণের ভাষায় কথা বলেন। জনগণের ধর্ম-কর্ম-আচার অনুষ্ঠান মেনে চলেন, তাদের দু:খ বেদনা হাসি আনন্দের সঙ্গি হতে পারেন বলেই তো তিনি রাজনীতিক। আমাদের দেশের ৯০ ভাগ মানুষ মুসলমান। আমাদের শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের ধর্ম এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ সম্পৃক্ত। তাই ধর্মকে বাদ দিয়ে এখানে যারা রাজনীতি করতে চাইবেন তারা জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বেন। আমাদের দেশে যারা ধর্মকে বাদ দিয়ে রাজনীতি করতে চেষ্টা করছেন তাদেরকে তো খালি চোখে দেখা যায় না। তারা তাদের আদর্শ নিয়ে থাকুক। কিন্তু যাদের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক রয়েছে, যারা বার বার জনগণের ভোট পেয়ে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হচ্ছেন তাদের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি বা তাদের রাজনৈতিক দল নিবন্ধন না করার

www.pathagar.com

দাবি দেশবাসীর কাছে কতটুকু গ্রহণযোগ্য সেটা অবশ্যই ভেবে দেখা দরকার। মুসলিম লীগ নেতা খান এ সবুর তার জীবদ্দশায় স্বাধীনতা উত্তরকালে একাধিক এলাকা থেকে দাঁড়িয়ে খুলনা ও সাতক্ষীরা থেকে পার্লামেন্ট সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও তাদের সহযোগী সংগঠন অনেক অপপ্রচার চালিয়েছিল। কিন্তু জনগণ তাদের অপপ্রচারে কান দেয়নি। তিনি বিপুল ভোটে জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি মুসলিম লীগ নেতা হলেও জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন করতেন না। সাম্প্রদায়িকতার বিশ্বাস করতেন না।

আমাদের দেশে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশসহ অনেক ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দল আছে যারা জঙ্গিবাদ বা সন্ত্রাস বাদে বিশ্বাস করে না। তারা গণতন্ত্র ও প্রচলিত আইন-কানুন মেনে রাজনীতি করতে চান বা করেন। তারা দেশে ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা এবং কোরআন হাদিসের আলোকে দেশ শাসন করতে চান। যদি জনগণ তাদের পক্ষে ভোট দেয় তাহলে ১৪ দল জনগণকে ঠেকাবে কিভাবে? প্রত্যেক দল তার উদ্দেশ্য আদর্শ এবং কর্মসূচি অনুযায়ী নির্বাচনে জনগণের রায় চইবে। এটাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। এ ক্ষেত্রে ধর্মভিত্তিক দলকে নির্বাচন করতে দেয়া যাবে না বা ধর্মভিত্তিক দলকে রাজনৈতিক দল হিসাবে নিবন্ধন করা যাবে না - এই দাবি মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

আমাদের দেশের এক শ্রেণীর রাজনীতি ও প্রগতিশীল বলে দাবিদার বুদ্ধিজীবী ধর্মের আচার আচরণ ও অনুশীলন দেখলেই বিব্রতবোধ করেন। আমি তাদের বলতে চাই যে, তারা যেন ভারতের প্রচারিত টিভি চ্যানেলগুলোতে প্রচারিত অনুষ্ঠান দেখেন। কারণ তাদের সকল চ্যানেলেই পূজা পার্বন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি, দেব-দেবীদের নিয়ে রচিত অনুষ্ঠান সব সময় প্রচার করে থাকে। অথচ ৯০% মুসলমানের দেশে রেডিও-টিভিতে প্রচারিত নাটক, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে আমাদের ধর্মীয় আচার, আচারণ, তাহজীব, তমুদ্দুন, ইতিহাস-ঐতিহ্য প্রচার করা হয় না। আমাদের নবী, রসূল (সা.), পীর, পয়গম্বর, ইসলামী চিন্তাবিদদের জীবনালেখ্য প্রচার করা হয় না। এসব প্রচার করলে নাকি আমাদের প্রগতিশীলতা বিনষ্ট হয়। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী দেশে রেডিও-টিভিতে সব সময়ই তাদের দেব-দেবীদের জীবনালেখ্য এবং রামায়ণ-মহাভারতের গল্পের ওপর ভিত্তি করে তৈরি অনুষ্ঠানাদি প্রচার করা হয়। যা আমাদের দেশের দর্শকরা বিশেষ করে তরুণ সমাজ আগ্রহ ভরে দেখে থাকে।

আমাদের দেশের তথাকথিত প্রগতিবাদীরা কেবল ইসলাম ধর্ম ভিত্তিক অনুষ্ঠান প্রচারেই বিরোধিতা করে না, তারা দেশের ইসলামী মনীষীদের জীবন কাহিনী প্রচারেরও বিরোধিতা করে থাকে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, তারা হিন্দু

www.pathagar.com

দেব-দেবী ও রামায়ণ-মহাভারতের গল্প অবলম্বনে রচিত অনুষ্ঠানকে সাদরে গ্রহণ করছেন। মানুষকে সৎ পথে পরিচালনার জন্য এবং ছাত্র-ছাত্রীদের সুনগারিক হিসাবে গড়ে তোলার নিমিত্তে প্রত্যেক দেশের মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়। কারণ সকল ধর্মই মানুষকে সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে জীবনযাপনের শিক্ষা দেয়। সুতরাং ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসী হলেই একজন মানুষ প্রগতি বিরোধী হবে এই ধারণা সঠিক নয়। অবশ্য এটা ঠিক যে, অতীতে এক সময় আমাদের দেশের ধর্মীয় নেতারা ইংরেজি শিক্ষার বিরোধিতা করতেন। ডাক্তারী শিক্ষা, নারী শিক্ষার বিরোধিতা করা হতো। কিন্তু এখন আর সেটা নেই। কিছুদিন আগেও টিভি দেখা, ফটো তোলাকে ইসলাম বিরোধী কাজ গণ্য করা হতো কিন্তু এখন আর সেভাবে বলা হয় না।

টিভিতে এখন অনেক সুন্দর সুন্দর শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। টিভিতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থা সম্পর্কে যে সকল শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করা হয় তার দ্বারা মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে বা পারছে। ইসলাম যে কেবল ধর্ম নয়, ইসলাম যে একটা পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা এটা জানতে হলে অবশ্যই আমাদেরকে যেমন কোরআন, হাদীস পড়তে হবে তেমনি রেডিও-টিভিতে বেশি বেশি করে ইসলামী অনুষ্ঠানাদি প্রচার করতে হবে। এতে সকল ধর্মের লোক ইসলাম সম্পর্কে অবহিত হবেন।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ যেমন ধর্মের বিরোধীদের বরদাশত করতে পারে না আবার মৌলবাদীদেরও সমর্থন করে না। দেশের মানুষ যেমন ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী আবার জেএমবি কিংবা হরকাতুল জিহাদেরও বিরোধী।

একটা বিষয় আমাদের বুঝতে হবে এবং বোঝাতে হবে যে, ইসলাম ধর্ম প্রগতি বিরোধী নয়। আর মুসলমান মানেই সন্ত্রাসী নয় বা জঙ্গী নয়। মুসলমানদের ওপর অন্যায় অবিচার করে, মুসলমানদের ওপর সাম্রাজ্যবাদের আগ্রাসন, জোর-জুলুম, নির্যাতন-নীপিড়ন ও জোর-জবর দখল চালিয়ে, তাদের নারী-শিশু ও বৃদ্ধদের ওপর অত্যাচার করায়, তাদের দেশ দখল করে নিয়ে তাদেরকে সন্ত্রাসের পথে ঠেলে দেয়া হয়েছে। বিশ্বের কোথাও কোনোদিন মুসলমানরা আক্রান্ত না হলে আক্রমণ করেনি। ইসলাম শান্তির ধর্ম। বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এটা বিশ্বের প্রত্যেক মুসলমানের কাম্য। কিন্তু

www.pathagar.com

সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দোসররা চায় বিশ্বকে তাদের মত করে নিয়ন্ত্রণ করতে। মুসলমানদের সঙ্গে এ নিয়েই বিরোধ। আর এই বিরোধের কারণেই কোথাও কোথাও মুসলমানরা রুখে দাঁড়িয়েছে। সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দোসররা এই রুখে দাঁড়ানোকে কোথাও সাম্প্রদায়িকতা বলছে, কোথাও বলছে ইসলামী ফ্যাসিইজম আবার কোথাও বলছে ইসলামী সন্ত্রাসবাদ। আসলে এখন বিশ্বে সন্ত্রাসবাদ চালাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও তাদের মিত্ররা। তারাই সন্ত্রাসী। যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বের মুসলমানদের খুশি করার জন্য রমজান মাসকে পবিত্রতম মাস হিসাবে স্বীকৃতি দিয়ে কংগ্রেসে বিল পাস করেছে। কিন্তু আফগানিস্তান থেকে ন্যাটো সৈন্য প্রত্যাহার কিংবা ইরাক থেকে মার্কিন বাহিনী প্রত্যাহারের ব্যাপারে কংগ্রেস কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে না। কাশ্মীরের মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলনে সমর্থন দিচ্ছে না। ফিলিস্তিনীদের স্বাধীনতার জন্য ইসরাইলের ওপর চাপ দিচ্ছে না। চেচনিয়ায় রাশিয়ার দখলদারিত্বের বিরুদ্ধে কথা বলছে না। অথচ তারা দেশে দেশে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীদের প্রতিষ্ঠার নামে দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে চাপ প্রয়োগ করে চলেছে।

আফ্রিকার দেশে দেশে আজ এ সংগ্রাম শুরু হয়েছে তার মূলেও সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দোসররা। সাম্রাজ্যবাদ সর্প হয়ে দংশন করে ওঝা হয়ে ঝাড় ফুঁক করছে। আফ্রিকার খনিজ সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য দেশের মধ্যকার রাজনীতিকদের দিয়ে গৃহযুদ্ধ বাধিয়ে দিয়েছে। এরপর শান্তিবাহিনী দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করছে। জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসীরাই সেখানে মূল শক্তি। কিন্তু এর পরও সাম্রাজ্যবাদ ও তাদের দোসররা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষদের সমর্থন দিচ্ছে। আমাদের দেশেও দেশপ্রেমিক জাতীয়তাবাদী ও ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে তথাকথিত বামপন্থী ও ধর্মনিরপেক্ষদের উসকানি দিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য ও ভারতসহ তাদের দোসররা। তাই দলের সংখ্যা বাড়ানোর জন্য আওয়ামী লীগ মহাজোট গঠনের চেষ্টা করছে। আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য দলগুলোর তেমন অস্তিত্ব না থাকলেও তারা নির্বাচিত কমিশনে যাবে বলে শোনা যাচ্ছে। তারা ধর্মীয় দল নিষিদ্ধ করার দাবি জানাচ্ছে। তাদের ভাষায় ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী দলগুলো স্বাধীনতা বিরোধী, যুদ্ধাপরাধী ও সাম্প্রদায়িক। কিন্তু আসলে ইসলাম কি সাম্প্রদায়িক ধর্ম? আসলে ইসলাম ধর্মে সাম্প্রদায়িকতার কোনো স্থান নেই। বর্ণ হিন্দুদের জুলুম-অত্যাচারের ফলে আজও ভারতে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে থাকে। আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসও অনেকটা তাই। এখানে জোর-জুলুম করে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করা হয়নি। বিশ্বে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আদর্শের কারণে। ইসলামের মূল আদর্শই হচ্ছে স্রষ্টার সৃষ্টিকে ভালবাসা। ধনী, গরিব সবাই সমান। ইসলামে উঁচু-নীচু, সাদা-কালো, শেখ, সৈয়দ, মোঘল, পাঠান নেই। তাই দেখা যায় অমুসলিমরা

www.pathagar.com

বেশি নিরাপদে থাকে মুসলিম দেশগুলোতে। ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় অমুসলিম বা সংখ্যালঘুরা আল্লাহর আমানত হিসাবে বিবেচনা করা হয় যদি জনগণ চায় তবে এদেশে ইসলামী শাসন চালু হবে এতে ভয় পাওয়ার কি আছে? কিন্তু আমরা জানি আমাদের দেশের মানুষ মধ্যমপন্থী। ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাস করে কিন্তু ধর্মরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় না। আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ যেমন ধর্মের বিরোধীদের বরদাশত করতে পারে না আবার মৌলবাদীদেরও সমর্থন করে না। দেশের মানুষ যেমন ধর্মনিরপেক্ষতার বিরোধী আবার জেএমবি কিংবা হরকাতুল জিহাদেরও বিরোধী। জঙ্গিবাদ ও ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধে মানুষ সদা সোচ্চার হওয়ায় সরকারের পক্ষে দ্রুত জেএমবি দমন করা সম্ভব হয়েছে। আবার নবী করিম (সা.) এর বিরুদ্ধে ব্যঙ্গচিত্র বা কার্টুন প্রকাশ করায় প্রথম আলো এবং মক্কার কাবাঘর সম্পর্কে অশালীন মন্তব্য করায় সাপ্তাহিক ২০০০ পত্রিকার বিরুদ্ধে জনগণ তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছে।

অর্থাৎ আমাদের দেশের মানুষ ডানও নয়, বামও নয়, মধ্যপন্থী। মধ্যপন্থীরা জাতীয়তাবাদী ও নির্ভেজাল দেশপ্রেমিক হয়। স্বাধীন সত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায়। কারো দাসত্ব করতে চায়না। কারো চোখ রাঙানো বা কারো আদেশ নির্দেশ মানতে চায় না। জাতীয়তাবাদীরা জাতীয় অর্থনীতির বিকাশ চায়। দেশের শিক্ষা, সংস্কৃতি, ধর্ম, অর্থনীতির সমৃদ্ধি চায়। এই জন্য সাম্রাজ্যবাদ, সম্প্রসারণবাদ এবং তাদের দোসররা জাতীয়তাবাদীদের উন্মেষ ঠেকানোর জন্য আইএমএফ, বিশ্বব্যাংক, এডিবি'র মত বিভিন্ন সংস্থা গঠন করে দেশে দেশে রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করছে। তারা বিভিন্ন দেশে নানা নামে তাদের এজেন্ট নিয়োগ করেছে। এসব এজেন্ট বিদেশী সংস্থা থেকে মাসোহারা পেয়ে থাকে। তাই তারা বিদেশী অর্থে সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, গোলটেবিল বৈঠক ইত্যাদি করে মিডিয়া খরিদ করে তাদের মতো করে খবর দিয়ে দেশের শিক্ষিত মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। বিভ্রান্ত করছে দেশের সাধারণ জনগণকে।

দেশে কে রাজনীতি করবে, ভোটাররা কাকে ভোট দেবে তা ঠিক করবে দেশের মালিক মোক্তার জনগণ। কিন্তু এক শ্রেণীর রাজনীতিক বা বুদ্ধিজীবীরা বিদেশী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে জাতীয়তাবাদীদের ঐক্য বিনষ্ট করার চেষ্টা করছে। এতে জাতীয়তাবাদীদের ক্ষতি হবে। লাভহান হবে বিদেশী এজেন্ট তথাকথিত প্রগতিবাদীরা। সুতরাং জাতীয়তাবাদ ও ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসীদের ঐক্যবদ্ধ হয়ে দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীদের মুখোশ খুলে দিতে হবে। কারণ সব কিছুর উপরে দেশ ও দেশের জনগণ। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এখন মহাসঙ্কটে আছে। এই সঙ্কট থেকে দেশকে উদ্ধার করতে হবে। #

[অত্র লেখাটি দৈনিক দিনকালে ০৪ নভেম্বর ২০০৭- তারিখে প্রকাশিত হয়-সম্পাদক।]

www.pathagar.com

সে সময় যুদ্ধাপরাধীরা যেভাবে রক্ষা পায়

মোড়ল নজরুল ইসলাম

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা এবং মুক্তির বিষয়টি নিয়ে নতুন করে আলোচনা-সমালোচনা শুরু হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে পক্ষে-বিপক্ষেও উত্থাপিত হচ্ছে নানা যুক্তি-তর্ক, নানা অভিযোগ-অনুযোগ। সম্প্রতি বিভিন্ন মহলের যুদ্ধাপরাধীদের নতুন করে বিচারের দাবির প্রেক্ষিতে ইস্যুটি নতুন আঙ্গিকে আলোচনায় আসছে। অভিযুক্তদের পক্ষে বলা হচ্ছে, দেশে কোন যুদ্ধাপরাধী নেই অথবা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধাপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা করে গেছেন।

অন্যদিকে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পক্ষের শক্তির অভিমত হচ্ছে বঙ্গবন্ধু সাধারণ যুদ্ধবন্দীদের সাধারণ ক্ষমা করেছিলেন। হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজ-এই চার শ্রেণীর যুদ্ধপরাধীদের বঙ্গবন্ধু ক্ষমা করেননি। বঙ্গবন্ধুর সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নিয়ে মুক্তি পায় ৩০ সহস্রাধিক কারাবন্দি। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবির প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য তোফায়েল আহমদ ইত্তেফাককে জানান, বঙ্গবন্ধু চার শ্রেণীর যুদ্ধাপরাধীদের কোনভাবেই ক্ষমা করেননি। ৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর ১৯৭৫ সালের ৩১ ডিসেম্বর তৎকালীন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক দালাল আইন প্রত্যাহার করে নেন। ফলে হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজের সঙ্গে জড়িত যুদ্ধাপরাধীরা মুক্তি পেয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু কখনই এই চার শ্রেণীর যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করেননি। বরং ঐ সময় এসব অপরাধের অভিযোগে অনেক যুদ্ধাপরাধীর বিচার প্রক্রিয়াধীন ছিল।

তবে জামায়াতের মহাসচিব বিএনপি জোট সরকারের সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মো. মুজাহিদ ইত্তেফাককে গতকাল বলেছেন, মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান যুদ্ধাপরাধীদের সাধারণ ক্ষমা করে যান। খুন, ধর্ষণ, লুটতরাজ ও অগ্নিসংযোগের সঙ্গে জামায়াতের কেউ জড়িত ছিল না। ফলে শেখ মুজিবুর রহমান সাহেব ১৯৭৩ সালে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করার পরও ক্ষমতায় ছিলেন। তিনি ক্ষমতায় থাকাকালেও জামায়াতের কোন নেতার বিরুদ্ধে মামলা হয়নি। এমনকি পরবর্তীতে মরহুম জিয়াউর রহমান দালাল আইন প্রত্যাহার করার ফলে কারাগার

www.pathagar.com

থেকে মুক্তিপ্রাপ্তদের মধ্যে খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজের সঙ্গে জড়িত জামায়াতের কোন নেতা ছিলেন না।

তবে আওয়ামী লীগ নেতা তোফায়েল আহমদ জানান, জিয়াউর রহমান দালাল আইন প্রত্যাহার করায় খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটতরাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জামায়াতের বহু নেতাই মুক্তি পেয়ে যান।

তবে ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জিয়াউর রহমান মুক্তিপ্রাপ্ত যুদ্ধাপরাধীদের রাজনীতিতেও পুনর্বাসিত করেন। এছাড়া জামায়াতের দাবি হচ্ছে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ দীর্ঘ ২১ বছর পর ক্ষমতায় আসার পরও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের উদ্যোগ নেয়নি।

এছাড়া প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে ১৯৭২ সালে সম্পাদিত ঐতিহাসিক সিমলা চুক্তির প্রেক্ষিতে ১৯৭৪ সালে দিল্লীতে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তানের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধীও ক্ষমা পেয়ে যান। পরে তাদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়। অথচ তৎকালীন সরকার ১৯৫ জন পাক সেনা যুদ্ধাপরাধীর বিচারের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন। ঐ সময় প্রশ্ন উঠে এমনকি কারণ ঘটেছিল যাতে তৎকালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লীতে পাক যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা করার সমাঝোতায় স্বাক্ষর করেন।

প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে, সিমলা চুক্তির প্রেক্ষিতে দিল্লীতে ১৯৫ জন পাকসেনা যুদ্ধাপরাধীর বিষয়ে সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রতিমন্ত্রী আজিজ আহমদ।

[এ রিপোর্টটি ০৬ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে দৈনিকে ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়- সম্পাদক।]

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধ সম্পর্কে একটি দলিল

কাজী সাঈদ

৩৬ বছরের পুরনো ইস্যু নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলছে বিভিন্ন মহল থেকে। তা হলো একাত্তরে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। জীবিত ছ'জন সম্মানিত মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার একজোট হয়ে এ দাবি উঠিয়েছেন সরকারের কাছে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশনের সাথে বৈঠক শেষে একটি দলের সেক্রেটারি জেনারেল সাংবাদিকদের সাথে প্রশ্নোত্তরকালে কিছু বক্তব্যের রেশ ধরেই এ দাবি তোলা হয়েছে। বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় যা দেখেছেন এবং দর্শক শ্রোতারা যা তার মুখে শুনেছেন, তা হলো : ০১, এ দেশে স্বাধীনতাবিরোধী কেউ নেই ০২, এ দেশে যুদ্ধাপরাধী কেউ নেই। এ দুটো বক্তব্যই এখন দলটিকে নতুন প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছে। এ দুটো বাক্যকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে একটা নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে যাওয়ার কাতারে শামিল হয়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী, মুক্তিযোদ্ধা সংসদসহ অনেক সংগঠন।

বিষয়টি এখন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা, উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য এবং নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত গিয়ে ঠেকেছে। নির্বাচন কমিশনের সাথে নির্বাচনী বিধিবিধান সংশোধনের পরামর্শদানমূলক বৈঠকে এরই মধ্যে বেশ কিছু রাজনৈতিক দল ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল হিসেবে কোনো দলকে নিবন্ধন না করার জন্য নির্বাচন কমিশনকে অনুরোধ করেছে।

অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, ইসলামী শক্তিকে রাজনৈতিক অঙ্গনে নিষিদ্ধ অথবা বিকলাঙ্গ করে রেখে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী এবং বাঙালি জাতীয়বাদীরা ভবিষ্যৎ নির্বাচনে খালি ময়দানে গোল দিয়ে বিজয়ী হয়ে ক্ষমতা দখলের আইনি এবং রাজনৈতিক কূটকৌশলগত চাপ দুটোই অব্যাহত রাখতে চাইছে। অথবা শতকরা নব্বই ভাগ মুসলমানের এ দেশে এ হীন রাজনৈতিক চক্রান্ত এবং কূটকৌশল কোনো দিনই শুভ ফল বয়ে আনবে না। 'ব্যাক ফায়ার' হতে বাধ্য।

যেমনিভাবে এ দেশে ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধানের মৃত্যু হয়েছে এবং 'ধর্মনিরপেক্ষেতার' লাশের ওপর সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সর্বশক্তিমান আল্লাহ তায়ালার ওপর অবিচল আস্থা এবং বিশ্বাস। রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা পেয়েছে ইসলাম। প্রধান উপদেষ্টার সরকারি আসনের পেছনে স্থান পেয়েছে 'লাইলাহা

www.pathagar.com

ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রাসূলাল্লাহু।' আর বিশ্বের বুকে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে একটি মডারেট মুসলিম দেশ হিসেবে।

প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ফিরে আসা যাক। উল্লিখিত দুটো বাক্যকে দু'ভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। প্রথমত, দুটো বক্তব্যই সঠিক মনে হবে যদি এভাবে ব্যাখ্যা করা যায় : মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে দেশ স্বাধীন হয়ে যাওয়ার পর দেশের সব নাগরিক স্বাধীনতাকে মেনে নেয়ায় এখানে আর কোনো স্বাধীনতাবিরোধী নেই। বিগত ছত্রিশ বছরে এ দেশে একজন যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধেও মামলা আদালত পর্যন্ত গড়ায়নি, শাস্তি তো দূরের কথা। হ্যাঁ, যুদ্ধাপরাধী ছিল- ১৯৫ জন পাকিস্তানি! তারা স্বদেশে ফিরে গেছে বিনাবিচারে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের এক মহান সেক্টর কমান্ডার মরহুম মেজর এম এ জলিলের এ বিষয়ক বক্তব্য হচ্ছে- 'হানাদার পাক বাহিনী যারা দীর্ঘ ৯টি মাস ধরে বাংলাদেশের বুকে অবলীলাক্রমে গণহত্যা চালিয়ে ইতিহাসের পাতায় এক জঘন্য অধ্যায় সৃষ্টি করল, তাদেরকে ভারতীয় সেনাবাহিনী কিসের স্বার্থে উদ্ধার করে নিয়ে গেল ভারতে? সেসব হত্যাকারী গণদস্যুদেরকে মুক্তিযোদ্ধাদের কাছে হস্তান্ত র করা হলো না কেন? যারা মুক্তিযুদ্ধের মৈত্রী বাহিনী হিসেবে বাংলাদেশের দরদি সেজে বাঙালিদেরকে উদ্ধার করতে এলো, তারাই বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া পাকিস্তানি হত্যাকারী বাহিনীকে নিরাপদ আশ্রয়ে উদ্ধার করে নিয়ে বাঙালিদের প্রেমের পরিচয় দিয়েছে না পাঞ্জাবি প্রেমের পরিচয় দিয়েছে?' মুক্তিযুদ্ধের মৈত্রী বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যাকারীদের প্রতি অতটা দরদি হয়ে ওঠার পেছনে কারণটা কি ছিল? রসুনের গোড়া নাকি এক জায়গায়। এসব মার্সিনারি আর্মির গোড়াও একই জায়গায়, আমেরিকার পেন্টাগনে। সুতরাং 'মুক্তিযুদ্ধ' 'স্বাধীনতা যুদ্ধ', 'পাক-ভারত যুদ্ধ' ওসব কিছুই না, লৌকিকতা মাত্র। সংগ্রামমুখর জনগণকে বিভ্রান্ত এবং হতাহত করে আন্তর্জাতিক মুরব্বিদের প্রভাববলয় ঠিক রাখাই হচ্ছে এসব 'যুদ্ধযুদ্ধ' খেলার আসল উদ্দেশ্য। তা না হলে মানবতার খাতিরে ও আন্ত র্জাতিক মহল থেকেই বাংলাদেশে গণহত্যাকারী পাকিস্তানি নরপশুদের বিচারের দাবি শোনা যেত। না, তেমন কিছুই হয়নি, হবেও না, যত দিন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মহল অভিশপ্ত সাম্রাজ্যবাদের প্রভাববলয় থেকে মুক্ত না হবে। *(মেজর জলিল রচনাবলী, পৃষ্ঠা-৬৪)*

এবার দেখা যাক, ৯৩ হাজার পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীকে কিভাবে স্বদেশে ফেরত পাঠানো হয়েছিল- কোন চুক্তি বলে? শোনা যাক সে ইতিহাস। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ঢাকায় ভারতীয় বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আত্মসমর্পণের দলিলে সই করেন পাকিস্তানের পক্ষে জেনারেল নিয়াজী এবং ভারতের পক্ষে জেনারেল অরোরা। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানী এ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি। এর পর পরাজিত পাকিস্ত ানী সেনাদের ভারত তাদের দেশে নিয়ে যায়। এরপর ২ জুলাই ১৯৭২ সালে

www.pathagar.com

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়, যা 'সিমলা চুক্তি' নামে পরিচিত। দুদেশের বিবদমান সমস্যাগুলোর সমাধান করে দুদেশের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের জন্যই এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বাংলাদেশের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ চুক্তির প্রতি পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। ১৭ এপ্রিল ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ভারতের সাথে সিমলা চুক্তির আলোকে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ-ভারত এবং ভারত-পাকিস্তানের কয়েক দফা আলোচনার পর বাংলাদেশ বিষয়ে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে ২৮ আগস্ট ১৯৭৩ সালে দিল্লিতে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তির মাধ্যমেই বাংলাদেশ-ভারত-পাকিস্তান ত্রিদেশীয় নাগরিক বিনিময় কার্যক্রম শুরু হয় ১৯ সেপ্টেম্বর ১৯৭৩ থেকে। এতে করে প্রায় ৩ লাখ নাগরিক নিজ নিজ দেশে ফিরে আসে। ফেব্রুয়ারি ১৯৭৪ সালে পাকিস্তান বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব মেনে নিলে ৫ এপ্রিল থেকে ৯ এপ্রিল ১৯৭৪ ভারতের নয়াদিল্লিতে ত্রিদেশীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ১৯৫ জন যুদ্ধবন্দীর বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। এ বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে অংশ নেয় ড. কামাল হোসেন, ভারতের পক্ষে সরদার সারওয়ান সিং এবং পাকিস্তানের পক্ষে আজিজ আহমদ। বৈঠক শেষে ত্রিদেশীয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির অনুচ্ছেদ ১৩ এর বক্তব্য ছিল, "The question of 195 Pakistani Prisoners of war was discussed by the three ministers, in the context of the earnest desire of the Goverments for reconciliation, peace and friendship in the sub-continent. The foreign minsiter of Bangladesh stated that the excesses and manifold crimes committed my Phese prisoners of war constituted, according to the relevant provisions of the U.N. General Assembly Resolution and international law, war crimes, crimes against humanity and genocide, and that there was universal consensus that persons charged with such crimes as the 195 Pakistan prisoners of war should be held to account and subjected to the due process of Law. The Minister of State for Defense and Foreign Affars of the government of Pakistan said that his government condemed and deeply regretted any crimes that may have been committed."

অনুচ্ছেদ ১৪-এর বক্তব্য ছিল : In this connection the three Ministers noted that the matter should be viewed in the context of the determination of the three countries to continue resolutely to work for reconciliation. The ministers further noted that following recognition, the Prime Minister of Pakistan had declared that he would visit Bangladesh in response to the invitation of the Prime Minister of Bangladesh and appeated to the People of

www.pathagar.com

Bangladsh to forgive and forget the mistakes of the past in order to promote reconciliation. Similarly, the Prime Minister of Bangladesh had declared with regard to the atrocities and destruction committed in Bangladesh in 1971 that he wanted the people to forget the past and to make a fresh start; stating that the people of Bangladesh knew how to forgive."

অধ্যায় ১৫ তে বলা হয়েছে, "In the light of the foregoing and, in particular, having regard to the appeal of the Prime Minister of Pakistan to the people of Bangladesh to forgive and forget the mistakes of the past. The Foreign Minister of Bangladesh stated that the government of Bangladesh had decided not to proceed with the trials as an act of clemency. It was agreed that the 195 prisoners of was may be repatiated to Pakistan along with the other Prisoners of War now in the process of repatriation under Delhi Agreement."

যুদ্ধাপরাধীদের তৎকালীন সরকারের পক্ষ থেকে ক্ষমা করে দেয়ার এ হলো ইতিহাস। এটা বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপক্ষের এক ঐতিহাসিক চুক্তি।

কলেবর না বাড়িয়ে মেজর এম এ জলিলের কৈফিয়ত ও কিছু কথা' থেকে দুয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে শেষ করছি। 'স্বাধীনতা অর্জনের ১৭ বছর পরেও আজ যারা নতুন করে পুনরায় স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষে কিংবা মৌলবাদের ভূত নিয়ে খেলা করতে আগ্রহী তাদের একটি সত্য জেনে রাখা প্রয়োজন জাতির আজ প্রয়োজন স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা, স্বাধীন মাটিতে বসবাসকারী প্রত্যেক মানুষের ন্যায়সঙ্গত অধিকার, মর্যাদা এবং নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করা। এই অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পথে আজ যেসব সামাজিক ও রাজনৈতিক শক্তি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে, প্রকৃতপক্ষে তারাই চিহ্নিত হবে দেশ ও জাতির শত্রু হিসেবে। সেই ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণই কেবল সর্বকালের দেশ প্রেমের সনদপত্র হতে পারে না। যদি কেবল তা হতো, তাহলে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরে যাদের জন্ম, তারা দেশপ্রেমিকের সারিতে দাঁড়ায় কিসের ভিত্তিতে?

মরহুম মেজর জলিল স্বাধীনতার ১৭ বছর পরে লিখেছিলেন, ৩৬ বছর পরও তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য এবং জাতীয় ঐক্য গঠনের উপাদানে লেখাগুলো সমৃদ্ধ। পাঠক এক বাক্যে তা স্বীকার করবেন।

আমরা কি মরহুম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'বাংলাদেশীরা জানে কিভাবে ক্ষমা করতে হয়', 'অতীতকে ভুলে গিয়ে নতুনের পথে যাত্রার' যে আহ্বান, তাকে প্রধান্য দিয়ে জাতীয় ঐক্যের নতুন ভিত রচনা করতে পারি না? #

[উল্লেখিত নিবন্ধটি ০৫ নভেম্বর ২০০৭ তারিখে দৈনিক নয়াদিগন্তে প্রকাশিত হয়- সম্পাদক।]

www.pathagar.com

যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নয়

ডাঃ ওয়াজেদ এ. খান

নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান যখন দেশে-বিদেশে ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে, প্রস্তুতি চলছে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের, ঠিক তখনই জনগণের দৃষ্টি ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার প্রয়াসে তিন যুগ পর পুরনো ইস্যু'৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী তুলে বিশেষ একটি মহল ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের একটি মন্তব্যের সূত্র ধরে এক শ্রেণীর কথিত বুদ্ধিজীবী, লেখক, সংস্কৃতিসেবী, সাংবাদিক ও রাজনীতিক যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করছেন। স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বর্তমান গণ-ফোরাম নেতা ডঃ কামাল হোসেন, যিনি ভারত ও পাকিস্তানের সাথে ত্রিপক্ষীয় চুক্তি স্বাক্ষর করে আসল যুদ্ধাপরাধীদের চিরতরে মুক্ত করে দিয়েছেন, যিনি ভালো করেই জানেন যুদ্ধাপরাধীদের আর বিচার করা সম্ভব নয়, তিনিও যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবীকারীদের উস্কে দিয়ে পরিণত হচ্ছেন হাসির খোরাকে।

'৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালে পাকবাহিনী বাংলাদেশের নিরস্ত্র নিরাপরাধ মানুষকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ধর্ষণ করেছে অগণিত মা-বোনকে। লুটপাট করেছে অসহায় মানুষের ধনসম্পদ। জ্বালিয়ে দিয়েছে গোটা দেশের শহর, বন্দর, নগরসহ বিস্তীর্ণ জনপদ। যুদ্ধ বরাবর ধ্বংস ডেকে আনলেও যুদ্ধেরও আন্তর্জাতিক একটি নিয়মনীতি আছে। আর সে নিয়মনীতি ভঙ্গকারীদেরকেই চিহ্নিত করা হয় যুদ্ধাপরাধী হিসেবে। সে কারণেই পাক সেনারা যুদ্ধাপরাধী। এসব যুদ্ধাপরাধীর বিচার চাওয়া অন্যায় কিছু নয়। মুক্তিযুদ্ধকালে যুদ্ধাপরাধী (War Criminal) পাক বাহিনীকে স্থানীয়ভাবে রাজাকার, আলবদর, আলশামসরা দালাল ও কলাবরেটর হিসেবে সাহায্য করেছে। এদের সকলের কঠোর শাস্তি হোক- এটাই ছিলো সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের গণমানুষের প্রত্যাশা। কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী

www.pathagar.com

লীগ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ভারত ও পাকিস্তানের সাথে "বোঝাপড়া স্মারক" স্বাক্ষরের মাধ্যমে যুদ্ধাপরাধী পাকসেনাদের মুক্ত করে দেন। এ প্রসঙ্গে আমরা যদি অতীত ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরাই তাহলেই অনেক কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে। একাত্তরের ১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনী ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ভারতীয় মিত্র বাহিনীর নিকট আত্মসমর্পণ করে। অর্জিত হয় চূড়ান্ত বিজয়। ৯৫ হাজার পাক যুদ্ধবন্দীর দায়ভার বর্তায় ভারতীয় বাহিনীর উপর।

বিজয়ের ২৫ দিন '৭২ সালের ১০ জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে এসে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার দু'সপ্তাহের মধ্যে ২৪ জানুয়ারী 'দালাল আইন অধ্যাদেশ' জারি করেন। প্রায় ১ লক্ষ ব্যক্তিকে ঐ সময়ে গ্রেফতার করা হলেও দালাল আইনে অভিযোগ আনয়ন করা হয় ৩৭ হাজার ৪শত ৭১ জনের বিরুদ্ধে। আসল যুদ্ধাপরাধী পাক সেনাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ না এনে প্রায় ৪০ হাজার ব্যক্তিকে দালাল আইনে অভিযুক্ত করায় তখনই এ নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে প্রশ্ন উঠে। প্রখ্যাত রাজনীতিক, লেখক এবং আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র প্রণেতা আবুল মনসুর আহমেদ ৪০ হাজার ব্যক্তিকে গণহত্যার দালাল আইনে না ফেলে আসল অপরাধীদের চিহ্নিত করে শাস্তি প্রদানের পরামর্শ দেন। দালাল আইন অধ্যাদেশ জারির পর পর দেশব্যাপী সংঘাত, বিদ্বেষ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণতা বৃদ্ধি পেলে দালাল আইন অধ্যাদেশে তিনটি সংশোধনী আনা হয় এবং অবশেষে ১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর ১ বছর ১০ মাস ৬ দিন পর হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগকারীদের বাইরে রেখে বাকী সকলের প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন শেখ মুজিব। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর শুধুমাত্র অভিযুক্তরাই নয়, যাদের সাজা হয়েছিলো তারাও ক্ষমার আওতায় পড়ে এবং ১৯৭৩ সালের ১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের দ্বিতীয় বার্ষিকীতে দেশের বিভিন্ন কারাগার থেকে ৩০ হাজার বন্দীকে মুক্তি দেয়া হয়। দালাল আইন বলবৎ থাকাকালীন ২ হাজার ৮শ' ৪৮

স্বাধীনতার পর কোন যুদ্ধাপরাধীর বিচার বাংলাদেশে হয়নি এবং কেউ পালিয়েও নেই। কেউ কোন যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে কোন থানায় কোন অভিযোগও করেনি অদ্যাবধি। যাদেরকে যুদ্ধাপরাধী বলা হচ্ছে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে অতীতে তাদের সাথেই গাঁটছড়া বাঁধতে দেখা গেছে তাদেরকে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে হবে।

www.pathagar.com

জনের মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিলো। তন্মধ্যে ৭'শত ৫২ জন দণ্ডপ্রাপ্ত হন। বেকসুর খালাস পান ২ হাজার ৬ জন। চিকন আলী নামে একমাত্র রাজাকারকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেয়া হয়। সুনির্দিষ্ট অভিযোগের অভাবে সেসময় গ্রেফতারকৃতদের গুরুদণ্ড দিতে পারেননি আদালত।

শেখ মুজিব চার ধরনের অপরাধীকে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা না করে তাদেরকে যুদ্ধাপরাধীর আওতায় এনে বিচারের বিধান চালু রাখলেও দালাল আইন জারির পর থেকে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সাড়ে ৭ কোটি মানুষের মধ্যে একজনের বিরুদ্ধেও হত্যা, ধর্ষণ, লুটপাট এবং অগ্নিসংযোগের অভিযোগ তথা যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ আনা হয়নি। দীর্ঘ এ সময় কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ উত্থাপিত না হওয়ায় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান ১৯৭৬-এর জানুয়ারীতে দালাল আইন বিলুপ্ত করে দেন। উন্মুক্ত করে দেন সম্প্রীতি ও বহুদলীয় গণতন্ত্রের পথ। শেখ মুজিব সরকার দালাল আইনে রাজাকার, আলবদরের বিচারের পাশাপাশি প্রাথমিকভাবে ১ হাজার ১৫ জন পাক সেনাকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করে। পরে যাচাই-বাছাই করে তা ১শ ৯৫ জনে নামিয়ে আনা হয় এবং বাংলাদেশের মাটিতে তাদের বিচার করা হবে এমন ঘোষণাও দেন শেখ মুজিব। কিন্তু শেখ মুজিব তার প্রতিশ্রুতি রাখতে পারেনি। ১৯৭৪ সালে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ত্রিপক্ষীয় বোঝাপড়া স্মারকে (মেমোর‍্যান্ডাম অব আন্ডারস্টান্ডিং) স্বাক্ষরের কারণে সরকারীভাবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের পথ চিরতরে রুদ্ধ হয়ে যায়। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডঃ কামাল হোসেন, ভারতের শরণ শিং এবং পাকিস্তানের আজিজ আহমেদ ১৯৭৪ এর ৯ এপ্রিল যে চুক্তি করেন তার ১৪ এবং ১৫ ধারানুযায়ী ত্রিদেশীয় শান্তি-সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার বিষয়কে অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়। ১৪ নং ধারা অনুযায়ী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের পর পাকিস্তানের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরের আশাবাদ ব্যক্ত করে' ৭১-এর নির্মম ঘটনা ও ভুলভ্রান্তি ভুলে গিয়ে ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখে বন্ধুত্বের আহ্বান জানান বাংলাদেশের প্রতি। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এতে সাড়া দেন এবং '৭১-এর নির্মমতা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিষয়টি বাংলাদেশের উদার জনগণ ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখে নতুনভাবে সম্পর্ক গড়তে চায় বলে প্রত্যুত্তোরে জানান।

এভাবেই স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না করে পাকিস্তান ও ভারতের সাথে শান্তি ও বন্ধুত্ব বজায় রাখার খাতিরে যুদ্ধাপরাধীদের মাফ করে দেন শেখ মুজিব। যুদ্ধাপরাধী পাকসেনাদের তুলে দেন ভারতের হাতে। তবে এ ব্যাপারে তৎকালীন নেতৃত্বকে যে ভারতের ইচ্ছে-অনিচ্ছের উপর অনেকটা নির্ভরশীল থাকতে হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের প্রথম হাইকমিশনার জে এন দীক্ষিত তার "লিবারেশন এন্ড বিয়ন্ড"

www.pathagar.com

গ্রন্থে লিখেছেন, শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের জুন মাসেই ভারতের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মুখ্য সচিব পিএন হাকসারের সাথে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রতি অনাগ্রহ প্রকাশ করেন এবং পাকিস্তানের সাথে বন্ধুত্ব গড়ে তোলার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন। '৭২ সালে সিমলা শান্তি চুক্তির পূর্বে ভারত পাকিস্তানকে এই মর্মে আশ্বস্ত করে যে, বাংলাদেশ যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করবে না। ইন্দিরা গান্ধী এবং তার সিনিয়র উপদেষ্টা ডিপি ধর যুদ্ধারাধীদের বিচারের ব্যাপারে প্রথমদিকে নমনীয় থাকলেও ভারতীয় পেশাদার সেনাবাহিনী কোনভাবেই রাজী ছিলো না পাকিস্তানী পেশাদার সেনা অফিসারদের বিচার হোক। ফলে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের বিষয়টি এভাবেই নিষ্পত্তি হয়ে যায়। যার জন্য পরবর্তীতে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক আদালতে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি করেননি শেখ মুজিব সরকার। এমনকি তার কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় এসে যুদ্ধাপরাধীদেরকে চিহ্নিত করে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি। আসল যুদ্ধাপরাধী (ওয়ার ক্রিমিনাল) পাকসেনাদের বিচার না করে দেশীয় দালাল (কলাবরেটর) দের যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চালিয়ে দিয়ে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ ছাড়া ঢালাওভাবে তাদের বিচারের দাবী করে ৩৬ বছর পর মিমাংসিত বিষয়টি নিয়ে দেশে বিভেদ-বিভ্রান্তি ও সংঘাত সৃষ্টির পাঁয়তারা কার স্বার্থে? কে কার বিচার করবে? দেশে এখন কারা এই যুদ্ধাপরাধী? এদের সংখ্যাইবা কত? এই পরিসংখ্যান কারো জানা নেই। কিছুদিন পর-পরই রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলের উদ্দেশ্যে এসব দাবী নিয়ে যারা মাঠে নামে তাদের আসল উদ্দেশ্য কি তা বুঝতে হবে। আজকে যারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবী করছে, তারা যখন ক্ষমতায় ছিলো তখন সময় ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করেনি। অথচ আজ দেশ যখন ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছে। একটি অনির্বাচিত সরকার রাষ্ট্রক্ষমতায়, যে সরকারের বৈধতা এবং গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে আবার সেই সরকারের কাছেই তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবী জানিয়ে মাঠ গরম করছে।

... যুদ্ধাপরাধীর বিচার হোক এটা সবাই চায়। কিন্তু যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবী তুলে কোন ব্যক্তি বা দলকে রাজনীতির ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা অগণতান্ত্রিক।

www.pathagar.com

এক সময় যারা দেশে গণতন্ত্র ধ্বংস করে একদলীয় শাসন কায়েম করেছিলো বাক ও ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ করে বিচারকদের নিয়োগ বদলি অপসারণের ভার নিজ হাতে তুলে নিয়েছিলো তারা নিজেদের অতীত ভুলে গেলেও দেশবাসী তা ভুলেনি। যুদ্ধাপরাধীদের মাফ করে দেয়ার জন্য তারা নির্লজ্জভাবে দায়ী করেছেন শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানকে। অজ্ঞতা প্রসূত অনেকে নূরেমবার্গ ট্রায়ালের সাথে বাংলাদেশের যুদ্ধাপরাধীদের তুলনা করতে গিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলেছেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ১৯৪৫ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত কয়েকটি ধাপে নূরেমবার্গ আন্তর্জাতিক আদালতে নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করা হয়। যাদেরকে আদালতে হাজির করা হয় তাদের শাস্তি দেয়া সম্ভব হলেও পলাতকদের গ্রেফতারের পর বিচারের রায় কার্যকর হয়।

স্বাধীনতার পর কোন যুদ্ধাপরাধীর বিচার বাংলাদেশে হয়নি এবং কেউ পালিয়েও নেই। কেউ কোন যুদ্ধাপরাধীর বিরুদ্ধে কোন থানায় কোন অভিযোগও করেনি অদ্যাবধি। যাদেরকে যুদ্ধাপরাধী বলা হচ্ছে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থে অতীতে তাদের সাথেই গাঁটছড়া বাঁধতে দেখা গেছে তাদেরকে। যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে হলে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনতে হবে। প্রধান উপদেষ্টা এক সমাবেশে এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেছেন, সংক্ষুব্ধ যে কেউই আইনের আশ্রয় নিতে পারেন। বিষয়টি যে এখন আর সরকারের হাতে নেই প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্যে তা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যুদ্ধাপরাধীর বিচার হোক এটা সবাই চায়। কিন্তু যুদ্ধাপরাধীর বিচারের দাবী তুলে কোন ব্যক্তি বা দলকে রাজনীতির ময়দান থেকে সরিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা অগণতান্ত্রিক। ৩৬ বছর পর ঢালাওভাবে এই দাবী তুলে দেশকে অস্থিতিশীল পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দেয়ার পরিণাম শুভ হবে এমনটি ভাবারও অবকাশ নেই। # *(লেখক : সম্পাদক, সাপ্তাহিক বাংলাদেশ নিউইয়র্ক, ইউএসএ)*

[অত্র নিবন্ধটি দৈনিক ইত্তেফাক ১৪ নভেম্বর ২০০৭-তারিখে প্রকাশিত হয়- সম্পাদক।]

www.pathagar.com

Overstressing the caretaker govt.

Editorial
The New Nation

THE present caretaker government has taken to itself more burden than its constitutionally mandated main tasks of holding free and fair elections. It has intimated changes in very vital areas of national life from anti-corruption measures to separation of the judiciary. Its capacities are already found too stressed among the tasks that it has taken up. Completing them within the remaining part of its tenure, only one year till the end of 2008, would test all its capacities. The size of the government has also not increased. The advisory council remains the same eleven in number and their energies of advisers are being spread thin and taxed heavily as they have to accomplish too much too soon.

In these circumstances, is it fair for some groups to go on pressing it for undertaking more tasks? The ones who are proposing these new tasks are at the same time found stressing the point that the incumbent administration should restrict its activities to only holding the national elections to form the next elected government. But when it comes to issues of their interest, they want the administration to take up more work load. Thus it is sheer hypocrisy on the part of those who say contradictory things such as the current administration is taking on more than it can handle while in the same breath they demand that this government should take up new tasks. The demand for trial and

www.pathagar.com

punishment of those who were blamed for war crimes in Bangladesh in 1971 is the case in point. These quarters did not raise this demand when they had the opportunity to implement it. Thus, one may think that this demand has been raised to create new irritants for the government as it is concentrating it energies on holding elections. The trial of war criminals cannot be just wished and done. It would call for some actions which would generate a lot of political heat and probably also violence. Would that be desirable in the greater interest of holding the elections smoothly?

Indeed, it was the government that took over immediately after the Liberation War that extended general amnesty to collaborators of the Pakistani forces, The move at that time was explained as necessary to build national unity and cohesion by forgiving and forgetting. Again, in the late nineties also they did nothing to try the once-charged war criminals. It was even speculated at that time that those in the corridors of power could go for a power sharing deal with the party they now want to blame. Exploring the possibilities of political alliance for going to power at that time was defended as stemming from hard political realities or the principle that there is no last word in politics. If such political opportunism was justified then, why such rigidity on these issues now. Whatever the motive for raising the demand afresh, it would have a negative effect on the preparations for holding national elections. #

[Editorial, The New Nation Date 14.11.07]

www.pathagar.com

চলমান ইস্যু সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন সংগঠন ও ব্যক্তিদের অভিমত

সংগ্রাম THE DAILY SANGRAM ১ নভেম্বর ২০০৭

জামায়াত সেক্রেটারি জেনারেলের বিবৃতি

বীর মুক্তিযোদ্ধাগণের প্রতি জামায়াত গভীর শ্রদ্ধাপোষণ করে॥ তারা দেশের গৌরব

গত ৩০ অক্টোবর জাতীয় প্রেক্ষাপটে আয়োজিত জাতীয় মসজিদের খতিব মরহুম আলহাজ উবাইদুল হকের দোয়ার মাহফিলে প্রদত্ত বক্তব্যের বরাত দিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল মান্নান মোল্লার নামে গতকাল বুধবার প্রকাশিত বৈষম্য ইত্তেফাক ও যুগান্তরে যে আপত্তিকর বক্তব্য তুলে ধরেছে সে সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারি জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ গতকাল এক বিবৃতি প্রদান করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, ৩০ অক্টোবর জাতীয় প্রেক্ষাপটে আয়োজিত জাতীয় মসজিদের খতিব মরহুম আলহাজ উবাইদুল হকের স্মরণে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে প্রদত্ত বক্তব্যের বরাত দিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল আবদুল মান্নান মোল্লার নামে গতকাল প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেফাক ও যুগান্তরে যে আপত্তিকর বক্তব্য তুলে ধরেছে সে সম্পর্কে জেনারেল মান্নান তার বক্তব্য পরিষ্কার করে [illegible]

(১.পৃঃ ৮-এর কলামের পর)

এ প্রসঙ্গে জেনারেল মান্নান মুক্তিযুদ্ধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করা জরুরী মনে করেন। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ বীর মুক্তিযোদ্ধাসহ বাংলাদেশের সকল জনগণের সর্বোচ্চ ত্যাগের ফসল এবং আল্লাহর দান। প্রেক্ষাপট স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব লক্ষ্যে যে স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছে তা [illegible] সমর্থন আন্দোলন ছিল। স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করাকে গৌরব ও সৌভাগ্যের বিষয়। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দেশের বীর মুক্তিযোদ্ধা স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের অবদান অবশ্যই জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ [illegible] শ্রদ্ধা প্রকাশ করে। জামায়াতে ইসলামী বিশ্বাস করে বীর মুক্তিযোদ্ধাগণ আমাদের দেশের গৌরব।

[illegible] বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব [illegible] করতে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ তার সাংবিধানিক ও ঈমানী ভূমিকা পালন করেছে। আওয়ামী লীগ সরকার দিন থেকে জামায়াতে ইসলামী এগিয়ে [illegible] স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখতে দুর্বিনীত গান করছে। দেশের উন্নতি, অগ্রগতি ও জনগণের কল্যাণের জন্য [illegible] দেশের স্বার্থের জন্য [illegible] এ পর্যায় অতীতে [illegible] জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী অংশগ্রহণ করবে এবং [illegible] নির্বাচনে [illegible] প্রতিনিধি [illegible] সুযোগ দেবেন।

[illegible] ২০০১ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনের [illegible] নিয়ে জামায়াতে ইসলামী [illegible] সরকারে [illegible] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ [illegible] দোয়া, "দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুদৃঢ়ের [illegible] এবং সার্বভৌম জাতীয়তাবাদের [illegible] জামায়াত [illegible] করেছে। জামায়াতে ইসলামী [illegible] দিন থেকে এই পর্যায় [illegible] ইসলামী বাংলাদেশ [illegible] দেবেন জাতীয় স্বার্থে [illegible] গান করছে, জামায়াতের [illegible] স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব [illegible] জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে সংকল্পবদ্ধ।" প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

www.pathagar.com

৩১ অক্টোবর ২০০৭

দৈনিক সংগ্রাম
THE DAILY SANGRAM

ইসিতে বক্তব্য সম্পর্কে প্রচার বিভাগ সেক্রেটারীর বিবৃতি

সিমলা চুক্তি ও দিল্লী এগ্রিমেন্ট জামায়াত সেক্রেটারী জেনারেলের বক্তব্য সমর্থন করে

গত ২৫ অক্টোবর নির্বাচন কমিশনের সাথে সংলাপ শেষে সাংবাদিকদের সামনে প্রদত্ত জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের বক্তব্যকে কেন্দ্র করে একটি বিশেষ মহল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে অপপ্রচার শুরু করেছে তার প্রতিবাদ জানিয়ে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের প্রচার বিভাগের সেক্রেটারী অধ্যাপক মো: তাসনীম আলম গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতি প্রদান করেছেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, "একটি বিশেষ মহল জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশের সেক্রেটারী জেনারেল ও সাবেক মন্ত্রী আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদের একটি বক্তব্যকে কেন্দ্র করে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু করেছে। ইতিপূর্বেও তারা বিভিন্ন সময়ে জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে এ ধরনের বিভ্রান্তিমূলক অপপ্রচার চালিয়েছে। তারা মুজাহিদের বক্তব্যকে বাজারে পাশ কাটিয়ে অপব্যাখ্যা করে মনগড়া বক্তব্য দিয়ে যাচ্ছেন। তাদের এ বক্তব্য তথ্য নির্ভর নয়। তৎকালীন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সরকার তদন্ত করে ১৯৫ জনকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল এবং তাদের বিচার না করে সিমলা চুক্তি ও দিল্লী এগ্রিমেন্ট-এর ভিত্তিতে পাকিস্তানে ফেরত পাঠানো হয়েছিল। এ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য সকলের অবগতির জন্য তুলে ধরা (২-এর পৃষ্ঠা ২-এর কলাম)

(১ পৃঃ ৮-এর কলামের পর)

হলো:- '১৯৭৩ সালের ১৭ এপ্রিল তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন প্রথম সফর করেন। এ উপলক্ষে ভারত-বাংলাদেশের একটা যুক্তঘোষণা প্রকাশ করা হয়। এই ঘোষণাতেই প্রথম বাস্তবিক কারণে পারস্পরিক ভিত্তিতে পাকিস্তানী যুদ্ধবন্দীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের কথা বলা হয়। (Document of India-Bangladesh-Pakistan Relations Dec. '71-June '74. An Information Service of India Publication, Sree Saraswati Press Limited, Calcutta, Page-43). এই ঘোষণায় যুদ্ধাপরাধীদের কোন সংখ্যা বলা ছিল না। এই ১৭ এপ্রিল তারিখেই বাংলাদেশ সরকার প্রথম বারের মত যুদ্ধাপরাধীদের বিচার সম্পর্কিত একটা সংবাদ-বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে। তাতে যুদ্ধাপরাধীদের সংখ্যা বলা হয় ১৯৫ জন (ঐ, পৃ. ৪৩-৪৪)। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২ দিন পর ১৯ এপ্রিল ডক্টর কামাল হোসেন বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে বলেন যে, ভারত-বাংলাদেশ একমত হয়েছে যে, মানবিক কারণে যুদ্ধাপরাধী ছাড়া যুদ্ধবন্দীদের অন্যান্য অটিকে পরবর্তে ত্রিপক্ষীয়ভাবে ব্যবস্থা করা হবে (ঐ, পৃঃ ৪৫-৪৬)।

অন্যদিকে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২৪ এপ্রিল তারিখে ভারতীয় পার্লামেন্টে জানান, সিমলা চুক্তিতে উল্লেখিত তথ্য আমার দিয়ে আলোচনায় পাকিস্তান আমাকে না। তাছাড়া প্রথমে যুদ্ধবন্দী বিষয়ে আলোচনা করতে চায়। পাকিস্তান বলেছিল যে, তাদের ৫৩ হাজার কিংবা তারও বেশী সৈন্য ও অফিসার আমের বিরুদ্ধে অপরাধের প্রমাণ আছে, তাদের বিচার বাংলাদেশ করলে তা তারা মেনে নেবে এই শর্তে যে, অন্যান্য সৈন্য ও অফিসারদের পাকিস্তানে ফেরত পাঠাতে হবে। কিন্তু পাকিস্তান এখন আমার কাছে কোন সৈন্যের বিচার আমি করতে চাইনে না। -আমি আশা করি মানবতার সমাধান হবে।' (ঐ, ৪৭,৫০, ৫১)। এর ১৯ মাস পরে ৭৮ জনের অতিরিক্ত পাকিস্তান ও ভারত একটা 'Joint Agreement' স্বাক্ষর করে। তাতে বলা হয়, বাংলাদেশ ইতিমধ্যে ঘোষণা দিয়েছে যে, যুদ্ধবন্দীদের অভিযোগগুলোর ত্রিপক্ষীয়ভাবে পৃথক সমাধানের যুদ্ধাপরাধীদের বিচার আমি করতে না। ত্রিপক্ষীয়ভাবে পরে বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তান এবং পরে শুধু যুদ্ধাপরাধীদের বিষয় নিয়ে আলোচনা করবে এবং 'আলোচনা যে আলোচনা সমাধান সম্ভব অধিকতর ভিত্তিতে' (ঐ, ৫৯, ৬০)।

এর পরে মার্চ ১৯৭৪ [illegible] থেকে ১৫ই [illegible] পাকিস্তান, বাংলাদেশ [illegible] সকলের পর হয় [illegible] সাথে বলা হয় যে, [illegible]

[illegible] ১৯৭৩ [illegible] ১৫ এপ্রিল বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে একটা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে ১৫টি অনুচ্ছেদ আছে। এর প্রথম ১২টি অনুচ্ছেদে যুদ্ধবন্দীদের আটকে পাকিস্তানে ত্রিপক্ষীয়ভাবে পৃথক ফেরত আনয়ন, আটকি ও অন্যান্যদের ভারতে তার বিবরণ দেয়া হয়। চুক্তির ১৩, ১৪ ও ১৫ নং অনুচ্ছেদে যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়ে আলোচনা ও তার ফেলার ত্রিপক্ষীয় হয়। ১৩ নং অনুচ্ছেদে যুদ্ধাপরাধীদের আলোচনা প্রসঙ্গে ত্রিপক্ষীয়ভাবে শান্তি, সমঝোতা ও সমন্বয়ের [illegible] বলা হয়। এই [illegible] বাংলাদেশের পক্ষে প্রধানমন্ত্রী ও [illegible] [illegible] ও [illegible] [illegible] ১৪ নং [illegible] যুদ্ধাপরাধীদের বিষয়ে আলোচনা ও [illegible] ত্রিপক্ষীয় হয়। [illegible]

www.pathagar.com

কাছে অতীতের 'ভুলকে' 'Forgive and Forget' এর দৃষ্টিতে দেখার জন্য আবেদন করেছে। তার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, With regard to the atrocities and destruction committed in Bangladesh in 1971 th e wanted the people to forget the past and to make a fresh start, ...People of Bangladesh 'know how to forgive'. ১৫ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, উপরোক্ত অবস্থার ভিত্তিতে এবং বাংলাদেশী জনগণের কাছে পাকিস্তান সরকারের ক্ষমার আবেদনের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ঘোষণা দেন যে, "The Government of Bangladesh had decided not to proceed with the trials as an act of clemancy. It was agreed that the 195 Prisoners of War may be repatriated to Pakistan alongwith the other Prisoners of War." অর্থাৎ বাংলাদেশ সরকার ক্ষমার নিদর্শন হিসেবে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার না চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমতভাবে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে যে, ১৯৫ জন যুদ্ধাপরাধী অন্যান্য যুদ্ধবন্দীদের সাথে দেশে প্রত্যাবর্তন করবে। (ঐ, পৃ. ৬৫-৬৮)।"

বিষয়টি একটু বিস্তারিত আলোচনা করা হলো এই জন্য যে, যুদ্ধাপরাধী চিহ্নিত হওয়া এবং ক্ষমার বিষয়টি রাতারাতি বা গোপনে হয়নি। যুদ্ধাপরাধীদের ক্ষমা ও দেশে ফেরত পাঠানো ছিল দীর্ঘ প্রক্রিয়া ও আলোচনার ফল এবং সবকিছুই ছিল প্রকাশ্য। ক্ষমা ঘোষণার এই দলিলে পাকহানাদার জল্লাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী গুলাম পির ও পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আজিজ আহমেদ বেঁচে না থাকলেও বাংলাদেশের পক্ষে হানাদারী বাহিনীর তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. কামাল হোসেন এখনও বেঁচে আছেন।

তৎকালীন মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের তালিকানুসারে যুদ্ধাপরাধীর সংখ্যা ছিল ১৯৫ জন। এর বাইরে আর কোন যুদ্ধাপরাধী নেই। সে সময় এর বাইরে যেসব কোন যুদ্ধাপরাধী না থেকে থাকলে, এখন আমরা দেখেছিলাম? সুতরাং সেদিন এখন আর কোন যুদ্ধাপরাধী নেই। জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুজাহিদ এই সত্য কথাটাই সেদিন বলেছেন।

মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৩ সালের ... ক্ষমা ঘোষণা করেন। ... ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের অভিযোগে অভিযুক্তরা এর আওতার বাইরে ছিল। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও মরহুম শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় ছিল। এ সময় জামায়াত নেতা ও কর্মীদের বিরুদ্ধে হত্যা, ধর্ষণ, লুটতরাজ, অগ্নিসংযোগের কোন ঘটনা ঘটেনি, একটি একটি ভিত্তিও হয়নি।" এর জন্য প্রমাণিত হয় যে, জামায়াতের সাথে সংশ্লিষ্ট তৎকালীন নেতা ও কর্মীবৃন্দ ধরনের ঘটনার সাথে জড়িত ছিলেন না। আশা করি এ ব্যাপারে এ সম্পর্কিত বিতর্কের অবসান হবে।" প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

নয়া দিগন্ত ১০ নভেম্বর ২০০৭

আলেমদের বিবৃতি

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিদাররা দেশ-জাতির শত্রু

নিজস্ব প্রতিবেদক

ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবির প্রতিবাদ জানিয়েছেন দেশের বিভিন্ন জেলার আলেমসমাজ। গতকাল পৃথক পৃথক বিবৃতিতে তারা বলেন, একটি গোষ্ঠী ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ধুয়া তুলে আসন্ন নির্বাচনের পরিবেশকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করতে চায়। তারা দেশ ও জাতির দুশমন।

চাঁদপুর ৪১৮ জন আলেম : তারা এক বিবৃতিতে বলেন, ধর্মহীন রাজনীতি মানুষকে অর্থ লোলুপতা, ১৬ পৃষ্ঠার ১-এর ক. দেখুন

১৬ পৃষ্ঠার পর

স্বার্থপরতা, চাঁদাবাজি ও বেহায়াপনার শিক্ষা দিয়ে থাকে। অন্য দিকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি মানুষকে সৎ, চরিত্রবান, পরোপকারী ও দেশপ্রেমের শিক্ষা দেয়। বিবৃতিদাতারা হলেন- মাওলানা মো: এমদাদ উল্লাহ খান, মাওলানা মো: আমিনুর আহমাদ, মাওলানা মো: সাইফুল্লাহ, মাওলানা মো: ইসমাঈল হোসাইন, মাওলানা মো: মহিউদ্দিন কামাল, মাওলানা মো: হেমায়েত উদ্দিন, মাওলানা মো: মমিনুল ইসলাম ভাণ্ডারদার, আবদুল কুদ্দুস, যাকারিয়াহ, শেখ ফরিদ, মাহমুদ রশিদ, মুফিজুর রহমান, সৈয়দ মুহম্মদ উল্লাহ, মোক্তার হোসাইন প্রমুখ।

নারায়ণগঞ্জের ১০১ জন আলেম : গতকাল এক বিবৃতিতে তারা বলেন, একটি চিহ্নিত মহল বিভিন্ন সময় ইসলাম ও ইসলামি ব্যক্তিদের নিয়ে বিদ্রূপ করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে তারা যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার অগণতান্ত্রিক দাবি তুলে দেশকে এক চরম বৈরাচারের দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। এ মহলের ব্যাপারে সচেতন থাকার আহ্বান জানান তারা। বিবৃতিদাতারা হলেন- মাওলানা মিজানুর রহমান, নূরুল হক, মোহাম্মদ হোসাইন, মালিক উল্লাহ, মহিবুল্লাহ, মোস্তাফিজুর রহমান, নূরুল আমিন, সালমান, শাহ নেয়ামত, ফজলুল করিম, আবুল কাশেম, হাফিজুল মান্নান, গোলামুল কুদ্দুস, হাফিজ উল্লাহ প্রমুখ।

পাবনা জেলা : পাবনা জেলার সমন্ত্রাদিক আলেম এক বিবৃতিতে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবির প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, ধর্মহীন রাজনীতি অরাজকতা ও দুর্শাসন ছাড়া কিছুই দিতে পারে না। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি তুলে দেশের ৯০ ভাগ মুসলমানের ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানা হচ্ছে। তারা বলেন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি তুলে তারা ধর্মের বিরুদ্ধে স্পষ্ট অবস্থান নিয়েছে। তাদের এই দাবি

যিদ্দের দাবিদাররা

অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন- মাওলানা আব্দুস ছামাদ, ইকবাল হুসাইন, আশরাফ আলী, আবুল রউফ, আবুল শফুর, আবুর রউফ, জাকারিয়া, শামেল আলম, আবুল আজিজ, শিহাবুল আলম, আবুর রউফ, মোস্তফা কামাল, আবুল আলিম, ফজলুর রহমান, আবুল জাব্বার, বেলাল হোসাইন, আব্দুল লতিফ, আবুল মালেক, ফুরকানুল হাকিম প্রমুখ।

কুড়িগ্রাম জেলা : জেলার ৩৫১ জন আলেম এক বিবৃতিতে বলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা দেশের স্বাধীনতাকে মসৃণ করে বর্তমান সরকারের গৃহীত পদক্ষেপগুলোকে বাধাগ্রস্ত করতে ইসলামি রাজনীতিকে স্তব্ধ করে দিতে চায়। তারা দেশ, জাতি, ইসলাম ও মানবতার শত্রু। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন- মাওলানা মোজাম্মেলুল হক, মো: ইলিয়াছ আলী, আব্দুল কুদ্দুস, মাওলানা আব্দুল মতিন ফারুকী, নিজাম উদ্দিন, আবুল মাল্লান, আমিনুল ইসলাম, রুহুল আমিন, নুরুল ইসলাম, রজব আলী, খাস কয়েরী, হাবিবুর রহমান, জোবায়দুল হক, ইসমাঈল হোসেন, কাওছার আলী প্রমুখ।

পটুয়াখালী জেলা : জেলার ৮৬ জন আলেম এক বিবৃতিতে বলেন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নয়, ৯০ ভাগ মুসলমানের এই দেশে ইসলামবিরোধী ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীদের রাজনীতি নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। তারা এসব চক্রান্তকারীর অপতৎপরতা বন্ধের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন- মাওলানা গোলাম খান, আমিনুল হক, আব্দুল খালেক, নূরুল ইসলাম, খন্দকার আব্দুল বারী, আ: ছাত্তার লস্কর, মোস্তাফিজুর রহমান, মহিউদ্দিন, আব্দুল খালেক ফারুকী, বি এম ওমর ফারুক, জালাল আহমেদ খান, ইয়াহিয়া খান, আব্দুল জব্বার, ইসহাক, মোর্শেদুল ইসলাম প্রমুখ।

www.pathagar.com

দিনকাল
১৩ নভেম্বর ২০০৭

ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি সংবিধান পরিপন্থী

... আলেম ও আইনজীবী

স্টাফ রিপোর্টার

চুয়াডাঙ্গার ৫০১ জন আলেম, মাগুরাগাঁও জেলার ৬৮৭ জন আলেম এবং কালকাঠির ৫০ জন আইনজীবী পৃথক বিবৃতিতে বাংলাদেশে ইসলামী রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিকে সংবিধান পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছেন। বিবৃতিতে তারা বলেন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি গণতন্ত্র উন্নয়নের পথকে আবারো বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। বর্তমান সরকার যখন গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি ও দুর্নীতিমুক্ত দেশ গড়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তখন একটি মহল যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি করে গণতন্ত্র ও উন্নয়নের পথকে বাধাগ্রস্ত করছে। সংবিধান যেহেতু ধর্মভিত্তিক রাজনীতি স্বীকৃত, তাই তাদের এ ধরনের দাবি ও তৎপরতা সংবিধানের পরিপন্থী। ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই তাদের এই তৎপরতা। ইসলামী রাজনীতির বিরুদ্ধে যারা কথা বলেছেন তারা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারীদের [illegible] কাজ করেছেন। বিবৃতিদাতারা বলেন, চুয়াডাঙ্গার মাওলানা মোঃ হাবিবুর রহমান, অধ্যক্ষ মাওলানা মোঃ [illegible] জলিল হাওলাদার, মাওলানা মোঃ মতিউর রহমান, মাওলানা মোঃ আবুল হাই, [illegible] মাওলানা আব্দুল খালেক, [illegible] মাওলানা মোঃ বদিউল আলম, মাওলানা মোঃ [illegible] রহমান, মাওলানা মোঃ [illegible], মাওলানা মোঃ মোমিনুর রহমান, [illegible] কাজী [illegible] প্রমুখ। মাগুরাগাঁও জেলার [illegible] মফিজুল ইসলাম, মোঃ হাসান আলী, মোঃ মুজাহারুল ইসলাম, মোঃ নুরুল উদ্দিন, মোঃ মমতাজুর রহমান, মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মোহাম্মদ মুকছেদ আলী, মোঃ খোরশেদ আলম, মোঃ ফজলে রাব্বী, মোঃ আকমল হোসাইন। কালকাঠির আইনজীবী মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন, মোঃ শাহ আলম মল্লিক, মোঃ হারুন অর রশিদ, মোঃ মাহবুব আলম প্রমুখ।

৬ নভেম্বর ২০০৭

বিশ্ববিদালয়ের ২৩৭ শিক্ষকের বিবৃতি

কোন দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার নজির নেই

॥ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩৭ জন শিক্ষক গতকাল সোমবার এক বিবৃতিতে বলেছেন, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধের দাবি অসাংবিধানিক ও অযৌক্তিক। পৃথিবীর কোন দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করার নজির নেই। তারা বলেন, অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে তা বানচাল করার জন্যই কিছু মহল এ দাবি তুলেছে। বিবৃতিতে ঢাকা

(১৫শ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান চৌধুরী, পুষ্টি ও খাদ্য বিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক ড. শেখ নজরুল ইসলাম, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যানের অধ্যাপক ড. আইয়ুব আলী, আইন ও বিচার বিভাগের অধ্যাপক ড. আব্দুল হান্নান, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. হাসান মোহাম্মদ প্রমুখ স্বাক্ষর করেন।

১৮৫ আইনজীবীর বিবৃতি

সোমবার এক বিবৃতিতে ১৮৫ জন আইনজীবী বলেন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি তুলে একটি মহল রাজনৈতিক অঙ্গনে অস্থিতিশীল করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয়েছে। বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতা মোহাম্মদ আলী, সিনিয়র এডভোকেট জমির উদ্দিন খান, এডভোকেট লিয়াকতউদ্দিন মিঠু প্রমুখ স্বাক্ষর করেন।

www.pathagar.com

নয়াদিগন্ত
১০ নভেম্বর ২০০৭

ক্রান্তিকালে যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উদ্দেশ্যমূলক

মে. জে. ফজলুর রহমানের সংবাদ সম্মেলন

নিজস্ব প্রতিবেদক

বিডিআর'র সাবেক মহাপরিচালক অব: মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান বলেছেন, দেশের বর্তমান ক্রান্তিকালে মহল বিশেষ কর্তৃক যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি উদ্দেশ্যমূলক। তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে বেকায়দায় ফেলে তাদের দুর্নীতিবিরোধী অভিযানসহ অন্যান্য ভালো কাজে বাধা সৃষ্টি করে দেশে একটি ঘোলাটে পরিবেশ তৈরি করতে চায় এরা। তিনি বলেন, যারা স্বাধীনতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবি করছে তারা নিজেরাই স্বচ্ছ নয়। স্বাধীনতাবিরোধীদের বিচার দাবি করে তাদের এখন জাতির মুরব্বি বনে যাওয়া খুবই রহস্যজনক। দেশে একটি ধূম্রজাল সৃষ্টির চেষ্টা করছে তারা। তিনি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ থেকে দেশ ও জাতির স্বার্থে সেনাবাহিনী যে গুরুত্বপূর্ণ কাজে নিয়োজিত রয়েছে, তাতে সবাইকে অকুণ্ঠ সমর্থন জানানোর আহ্বান জানান।

গতকাল বারিধারায় তার সংগঠন নির্বাচনী জনঅন্দোলনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে ফজলুর রহমান এ সব কথা বলেন। চার বছর আগে গঠন করা তার এ দলের বিভিন্ন কার্যক্রম তুলে ধরে তার সাথে কাজ করার জন্য দলমত নির্বিশেষে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। ফজলুর রহমান গণফোরাম সভাপতি ড. কামাল হোসেন এবং সাবেক প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর নাম উল্লেখ করে বলেন, এরা মুক্তিযুদ্ধের সময় কোথায় ছিলেন, কী করেছিলেন ১০ পৃষ্ঠার ৩-এর ক. দেখুন

ধীদের বিচারের দাবি

১ম পৃষ্ঠার পর

জাতিকে নিয়ে তা খতিয়ে দেখতে হবে। তিনি বলেন, ড. কামাল হোসেন মুক্তিযুদ্ধের ৯ মাস পাকিস্তানে অবস্থান করেছিলেন। তিনি বলেন, 'তিনি (ড. কামাল) মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন কি না আমার জানা নেই।' অপরদিকে বি. চৌধুরী ৩৬ বছর আগে কী করেছিলেন তার অনুসন্ধান করা দরকার। তিনি বলেন, যুদ্ধাপরাধীদের বিচার প্রচলিত আইনে সম্ভব। তিনি প্রশ্ন করেন, ৩৬ বছরে আওয়ামী লীগ বিএনপি কি করেছিল? তারা কেন যুদ্ধাপরাধীদের বিচার করতে পারল না; তিনি বিএনপি নেতা মীর শওকত আলীর একটি বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, কেন তিনি জিয়াউর রহমানের সময় বিএনপি থেকে পদত্যাগ করেননি। জিয়াউর রহমান যখন জামায়াতে ইসলামী নেতা অধ্যাপক গোলাম আযমকে এ দেশে পুনর্বাসনের সুযোগ করে দেন, তখন তিনি (মীর শওকত) কেন বিএনপি থেকে পদত্যাগ করেননি? ফজলুর রহমান আওয়ামী লীগকে উদ্দেশ করে বলেন, "আপনারা তো ৯৬ সালে জামায়াতের সাথে একত্রে বিএনপি'র বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছিলেন, তখন কেন স্বাধীনতাবিরোধী বলে তাদের বিচার করেননি।" তিনি বলেন, শেখ মুজিব সবাইকে ক্ষমা করে দেননি। বিশেষ করে যারা গণহত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটে জড়িত ছিল তাদের বিনা বিচারে ছেড়ে দেয়ার কথা কখনো তিনি বলেননি। এসব কর্মকাণ্ডে তখন কারা জড়িত ছিল তার অনেক প্রমাণ বর্তমানে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে রক্ষিত আছে বলে তিনি জানান।

ফজলুর রহমান ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি প্রসঙ্গে বলেন, ইসলামে কোথাও মানবতাবিরোধী কথা নেই। একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান এটি। তিনি বলেন, ইসলাম যদি মৌলবাদ হয়ে থাকে তাহলে কমিউনিজমকেও মৌলবাদ বলতে হবে। কারণ কমিউনিস্টরা ভারতে কিভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে তা সবাই জানে।

www.pathagar.com

নয়া দিগন্ত

১১ হাজার আলেম শিক্ষক ও চিকিৎসকের বিবৃতি

দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে একটি মহল

নয়া দিগন্ত ডেস্ক ১৪/১১/০৭

ঢাকা মহানগরীর ১০ হাজার বিশিষ্ট আলেম এবং দেশের অন্যান্য স্থানের আরো প্রায় এক হাজার শিক্ষক, চিকিৎসক ও আইনজীবী গতকাল পৃথক বিবৃতিতে বলেছেন, ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধের কথা বলে একটি চিহ্নিত মহল দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। তারা বলেন, বাংলাদেশের মানুষের মন-মানসে ইসলামী ভাবধারা লালিত। সেই ভাবধারা থেকে এ দেশের জনগণকে কোনোভাবেই বিচ্ছিন্ন রাখা যাবে না। তারা বলেন, আগামী নির্বাচন যাতে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয় সেজন্য দেশবাসী ১৩ পৃষ্ঠার ৪-এর ক. দেখুন

১৯ পৃষ্ঠার পর

সরকারের দিকে চেয়ে আছে। সরকারের উচিত কারো ষড়যন্ত্রে পা না দিয়ে রোডম্যাপ অনুযায়ী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে এগিয়ে যাওয়া। বিবৃতিদানকারী আলেমরা হলেন, শায়খুল হাদিস মাওলানা আবুল বারাকাত ইউসুফ আল মাদানী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, ড. মাওলানা কালাম আহসান, অধ্যাপক ড. আ: রহমান মাদানী, মুফতি নাজমুস সালেহী, মাওলানা কামালুদ্দীন প্রমুখ।

অপর এক বিবৃতিতে চরমোনাই পীর সাইয়েদ কাওছার বিন ইসহাক বলেছেন, একটি গোষ্ঠী বর্তমান সরকারকে ব্যর্থ ও অকার্যকর করার জন্য ৩৬ বছরের পুরনো ঐতিহাসিকভাবে মীমাংসিত যুদ্ধাপরাধী ইস্যুকে জাতির সামনে দাঁড় করিয়েছে।

চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, চট্টগ্রাম দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন উপজেলার ২০১ জন শিক্ষক এবং চট্টগ্রামের ১১৪ জন বিশিষ্ট চিকিৎসক গতকাল পৃথক বিবৃতিতে বলেন, ষড়যন্ত্রকারীরা দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিতে চায়।

বিবৃতিদাতাদের মধ্যে রয়েছেন পরিষদের জেলা আহ্বায়ক অধ্যাপক মাহমুদুল হাসান, অধ্যাপক নিজাম উদ্দীন, অধ্যক্ষ তাফাজুল হোসাইন, অধ্যক্ষ জয়নুল আবেদীন প্রমুখ।

চট্টগ্রামের ১১৪ জন বিশিষ্ট চিকিৎসকও ধর্মভিত্তিক রাজনীতি বন্ধের দাবিকে নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত বলে আরেক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন। চিকিৎসকবৃন্দ হচ্ছেন- ডা. মুসলিম উদ্দিন সবুজ, ডা. এহতেশাম উদ্দিন, ডা. এম এ মাজেদ, ডা. আবদুস সালাম, ডা. মুহিমউদ্দিন, ডা. বাবুল ওসমান চৌধুরী, ডা. আবু নাসের, ডা. আবদুস সালাম প্রমুখ।

দৈনিক জনকণ্ঠ

১০ নভেম্বর ২০০৭

ধর্মহীন রাজনীতি নিষিদ্ধ করতে ৪১৮ আলেমের আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নয়- ধর্মহীন রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়েছেন ঢাকার চার শ' ১৮ জন আলেম। গতকাল এক বিবৃতিতে তারা এ দাবি জানান। এতে বলা হয়, সম্প্রতি একটি চিহ্নিত গোষ্ঠী ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার ধুয়া তুলে আসন্ন নির্বাচনের পরিবেশকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করতে চায়। এরা দেশ ও জাতির দুশমন, সংবিধানের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী এবং দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী। বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এরা দেশকে অস্থিতিশীল করে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের সুনাম ক্ষুণ্ন করতে এবং দেশের স্বাভাবিক পরিবেশের বিঘ্ন ঘটাতে চায়। এরা ঈমান, আকিদা ও মুসলমানদের দুশমন। এতে বলা হয়, ধর্মহীন রাজনীতি মানুষকে অর্থ লোলুপতা, চরিত্রহীনতা, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজ ও বেহায়াপনার শিক্ষা দিয়ে থাকে। অন্যদিকে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি মানুষকে সৎ চরিত্রবান, পরোপকারী ও দেশপ্রেমই শিক্ষা দিয়ে থাকে। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন মওলানা এহসান উল্লাহ খান, মানসুর আহমাদ মিয়া, সাইফুল্লাহ, ইসমাইল হোসাইন, মহিউদ্দিন কামাল, হেমায়েত উদ্দিন, মমিনুল ইসলাম তালুকদার, আবদুল কুদ্দুস, দাবীবুল্লাহ, লেখ ফরিদ, হারুনুর রশীদ, মুজিবুর রহমান, সৈয়দ মহম্মদ উল্লাহ প্রমুখ।

রাজশাহী ব্যুরো জানায়, রাজশাহীর ৩৬৫ জন ইমাম ও মুয়াজ্জিন দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ করেছেন। তারা হলেন- মাওলানা আবদুল খালেক, মাওলানা হাবিবুর রহমান, মাওলানা আবদুল ওয়াহেদ, মাওলানা এ টি এম মনসুর রহমান, মাওলানা নজরুল ইসলাম, মাওলানা হাসান আলী, মাওলানা আবদুল জলিল, মাওলানা ইসহাক আলী, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখ।

রাজশাহীর ৭৭১ জন মুহাদ্দিস ও মুদাররিসও অনুরূপ বিবৃতি দিয়েছেন। বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেছেন মাওলানা আবুল কালাম আযাদ, মাওলানা হাবিবুর রহমান, মুহাদ্দিস মুজাফ্ফর হোসেন, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, অধ্যাপক আমজাদ হোসেন, অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল মামুন, মাওলানা জাকারিয়া, মাওলানা নিজামুদ্দীন, মাওলানা আশরাফুল ইসলাম প্রমুখ।

... নির্বাচন বানচালের চক্রান্ত ৭২

www.pathagar.com

দেশকে আধুনিকীকরণ করা
ও নির্বাচন ব্যবস্থার
চরিত্র
সোসাইটি প্রকাশ